বিমল কর

শ্রীশেখর বসু

কল্যাণীয়েষু

(শমীক/ বলত, সে ক্ষণজন্মা পুরুষ।) ক্ষণজন্মা শব্দটার সে যা অর্থ করত তাতে বন্ধুরা চমৎকৃত না হয়ে পারত না। মনে মনে ভাবত, শমীককে অভিধান সংশোধনের কাজে লাগালে বাংলা ভাষার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শমীক বলত, তার জন্মই সর্বনাশের মধ্যে। সাতচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে সে জন্মেছিল। তার জন্মমুহূর্তে শহর কলকাতার ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছিল সরবে। শমীককে অভ্যর্থনা কর[illegible]কে এত শঙ্খধ্বনি, কাঁসর-বাদ্যের ঘটা হবে—এটা মনে করা ভুল। পনেরোই আগস্টের সেই প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে শমীক কেমন করে জন্মে গেল এটা বিধাতাই বলতে পারেন। শমীক নিজে অবশ্য বলে, বিধাতা অত কাঁচা হাতের মানুষ নন, জেনেশুনেই শমীককে যথাসময়ে পাঠিয়েছিলেন। তার জন্ম—সিম্বলিক।

বিধাতা শমীককে নিয়ে আরও কিছু কিছু রহস্য করেছিলেন। মাতৃগর্ভ থেকেই সে এক মর্মান্তিক বন্ধন নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। নাড়িটা কেমন করে যেন শেষ সময়ে তার গলার কাছে জড়িয়ে যায়। জলজ শ্যাওলার মতন নীলাভ রঙ হয়ে গিয়েছিল তার, তেমনই নিষ্প্রভ, লালাময়। সেই মুহূর্তেই শমীক আবার ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু শমীককে যিনি [illegible] হাত দিয়ে ধরে নিয়েছিলেন তিনি অসাধ্য সাধন করলেন। পাঁচ-সাতটা দিন যমে-মানুষে টানাটানি চলল, অনেকখানি অক্সিজেন বুকে পুরে শমীক তার জীবনীশক্তি ফিরে পেল। মেডিকেল কলেজের শিশুজন্মের ইতিহাসে শমীক এক বিরল দৃষ্টান্ত।

শমীক তার বন্ধুদের বলে, তোমরা জন্মেছ আঁতুড়ঘরে, আমি জন্মেছি ক্রাইসিসের মধ্যে; সর্বনাশ দিয়েই আমার শুরু।

শমীকের জন্মের সময় তার বাবা দেবপ্রসাদ কলকাতাতেই ছিলেন না। তিনি ছিলেন দিল্লিতে। দেবপ্রসাদ তখনকার দিনের বড় সরকারী কর্মচারী। স্বাধীনতা লাভের সেই দিনগুলিতে, সরকারী ব্যস্ততা হুড়োহুড়ির সময় ভদ্রলোক ঝুড়ি ঝুড়ি কাগজপত্র নিয়ে অপরঅনাদের সঙ্গে দিল্লি ছোটাছুটি করছিলেন। কলকাতায় বাড়িতে কী ঘটে যাচ্ছে এটা তাঁর অগোচরে ছিল। দেবপ্রসাদকে এ-জন্যে ততটা দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর কাজের গুরুত্ব বাদ দিলেও অন্য একটা কথা থেকে যায়। মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই যে শমীক সংসারে চলে আসবে তা তাঁর জানা ছিল না।

দেবপ্রসাদ না থাকলেও ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্যে ছিলেন চারুপ্রসাদ, শমীকের কাকা। আর ছিলেন ললিতমোহন, শমীকের মামা, ডাক্তার মানুষ। এই দুটি মানুষের কয়েক দিনের ক্ষুধাতৃষ্ণা হরণ করে শমীক যখন শেষ পর্যন্ত প্রদীপের পলকা শিখার মতন বেঁচে উঠল ততদিনে দেবপ্রসাদ কলকাতায় ফিরেছেন। হাসপাতাল থেকে দিন কুড়ি-বাইশ পরে দেবপ্রসাদ স্ত্রীপুত্রকে বাড়িতে নিয়ে এলেন যদিও তবু ছেলের আয়ু সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

নিজের জন্মের সময়ক্ষণ, কোন্ অবস্থায় কেমন করে তার আবির্ভাব—এসব গল্প বাড়ির লোকের মুখে শুনতে শুনতে একদিন শমীক আবিষ্কার করে ফেলল, সে ক্ষণজন্মা পুরুষ। তখন তার বয়েস হয়ে গিয়েছে, মগজ নিজের মতন কাজ করতে শুরু করেছে।

শমীক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করার আগে তার পারিবারিক ইতিহাস অল্পস্বল্প জানা দরকার। ওরা মধ্য কলকাতার মানুষ। শমীকের ঠাকুরদার বাবা—অর্থাৎ তার প্রপিতামহ কৃষ্ণনগরের দিক থেকে ভাগ্যান্বেষণের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। পেশকারী বৃত্তিতে অল্প দিনেই তাঁর পটুতা জন্মায়। এই উদ্যোগী পুরুষের ওপর লক্ষ্মী সদয়া হয়ে ওঠেন অচিরাৎ। পেশকারীর পয়সায় তিনি

কলকাতায় ঘরবাড়ি করেন। শমীকের ঠাকুরদা ছিলেন আরও উদ্যোগী। তখন কলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রচণ্ড হাকডাক। ভদ্রলোক ধর্মতলায় বিশাল এক দোকান দিলেন. সাইনবোর্ডের মাথায় লেখা থাকল : 'ক্যালকাটা স্টোর্স : ওয়াইন মার্চেন্ট।' শোনা যায়, তখনকার কলকাতায় লাটবাড়ির খানাপিনাতেও যাদের মত্ত সরবরাহ করার অধিকার ছিল শমীকের ঠাকুরদার ক্যালকাটা স্টোর্স তার অন্যতম 'বাই অ্যাপয়ন্টমেন্ট অফ্ হিজ ম্যাজেস্টিস সার্ভিস'-এর তকমা ছিল তাঁর।

ঠাকুরদার দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী নীরবালা যক্ষ্মারোগে মারা যান। তিনি নাকি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম মনোরমা। তিনি শেষের দিকে উন্মাদ হয়ে পড়েছিলেন। দুই স্ত্রীর জন্যে ঠাকুরদা কোথাও কোনো কৃপণতা করেন নি, বসনেভূষণে নয়, ঝি-দাসীতে নয়, চিকিৎসার জন্যেও নয়। শুধু দুই স্ত্রীই মনঃকষ্ট নিয়ে বিগত হয়েছেন। ঠাকুরদা তাঁর সেকালের বনেদিঅনার সমস্ত আদব বজায় রেখেছিলেন। পাথুরেঘাটায় তাঁর এক উপপত্নী ছিল। যৌবনকালে এই ব্যাপারে তিনি এত বেশী আসক্ত ছিলেন যে, নীরবালাকে নিত্যই আঁখিনীরে ভাসাতেন। বেচারা নীরবালা স্বামী-সঙ্গসুখে বঞ্চিত হয়ে শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়রোগের কবলে পড়েন, যক্ষ্মায় ধরে। ওষুধে বিসুধে কিছুই হল না। নীরবালাকে পুরী-দেওঘরে রেখে হাওয়া-বদল করানো হল। নীরবালার দিন তখন ঘনিয়ে আসছে, বাড়াবাড়ি অবস্থা কলকাতার বাড়িতে যাগযজ্ঞ চলল সপ্তাহখানেক ধরে, তবু তিনি চলে গেলেন। শমীকের ঠাকুরদা তার স্বর্গের পথ প্রশস্ত করতে শাস্ত্রমতে ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধকর্ম করালেন এবং নীরবালার একটা ছবি বড় করে বাঁধিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিলেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমার বেলায় বলা যায় —তিনি নীরবালার তুলনায় স্বামীগৃহে বেশীদিন কাটাতে পেরেছেন, স্বামীসঙ্গও অধিক

পেয়েছেন। কিন্তু কাঁটার মতন তাঁর মনেও সেই একই অশান্তি বরাবর বিঁধে ছিল। স্বামী তখন আর পাথুরেঘাটায় যান না, সুরী লেনে রক্ষিতা রেখেছেন। মনোরমার উন্মাদ হয়ে যাবার পিছনে হয়ত আরও কোনো কোনো কারণ ছিল। তার মধ্যে একটা কারণ—তাঁর রাগ, জেদ, অহংকারের বাড়াবাড়ি। যে মানুষ তুচ্ছ কারণে বিশ-পঁচিশটা ফরাসডাঙ্গার অমন মিহি দামী শাড়ি উনুনের ওপর টান মেরে ফেলে দিয়ে আসতে পারেন, রাশি রাশি কাঁসার বাসন দোতলা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীচে ফেলে ঝনঝন করে ভাঙতেও যাঁর বাধে না—তাঁর উন্মাদ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য কি! মনোরমা যখন মারা যান শমীকের ঠাকুরদার বয়েস তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বছর ছয় আরও বেঁচে ছিলেন তিনি। সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ একদিন মারা যান ভদ্রলোক।

শমীকের বাবা দেবপ্রসাদ নীরবালার সন্তান; চারুপ্রসাদ মনোরমার। শমীকের এক পিসীও আছেন, গোরীপিসী, চারুপ্রসাদের ছোট। শমীক তার ঠাকুরদাকে দেখে নি। সে তার মা-বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান নয়, তার মাথার ওপর আরও দুজন ছিল, একজন আঁতুড়ঘরেই মারা যায়, পরের জন অবশ্য আজও জীবিত, শমীকের দিদি শচী। দিদির জন্মের অনেক পরে শমীক এসেছে। বছর দশ পরে। দেবপ্রসাদের সামান্য বেশী বয়েসের সন্তান শমীক। আশালতার শরীর-স্বাস্থ্য যখন ভাঙতে শুরু করেছে তখন শমীক তাঁর পেটে আসে। মনে মনে ভয় ছিল আশালতার, এতকাল পরে সন্তান পেটে এসেছে, নির্বিঘ্নে সমস্ত মিটে যাবে কিনা কে বলতে পারে। দেবপ্রসাদ নিজেও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী আশালতার মনে মনে একটি পুত্রের সাধ ছিল। ভগবান অবশ্য সে সাধ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করলেন।

শমীক তার ঠাকুরদাকে চোখে দেখে নি; ছবি দেখেছে। নীচে তার কাকার যেটা কাজকর্মের ঘর, যে-ঘরে কাকার মক্কেলরা

সঙ্কে থেকে ভিড় করে বসে থাকে—সেই ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদার মস্ত একটা ছবি রয়েছে। অয়েল পেইন্টিং। একেবারে ধূসর হয়ে গেছে ছবিটা। ধুলো জমেছে পুরু হয়ে, রঙ ফিকে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মানুষের যা যা দেখার দরকার করে ঠাকুরদার ছবিতে তার প্রায় সবই আছে—চোখ মুখ কান শরীরের বারো আনা অংশই। চৌকোনো মুখ, মাথায় তেমন একটা চুল নেই, পাতলা চুল, চোখ ছোট এবং গোল গোল, নাক মোটা, ভারী চোয়াল, দাড়ি আছে, ঠোঁট চোখে পড়ে না। ঠাকুরদার গায়ে গলাবন্ধ কোট, বুকপকেটের কাছে ঘড়ির চেন দেখা যাচ্ছে, হাতে বাহারী ছড়ি। শমীক বেশ লক্ষ করে ছবিটা দেখেছে অনেকবার। তার মনে হয়েছে, প্রচণ্ড বৈষয়িক বুদ্ধি, আত্মপ্রসাদ এবং খানিকটা অহঙ্কার ছাড়া ঠাকুরদার চেহারায় কিছু নেই। সবত্রই একটা স্থূলতা এবং ভোগের চিহ্ন স্পষ্ট।

ওই ছবি দেখতে দেখতেই শমীক একদিন তার কাকা চারু-প্রসাদকেই বলেছিল, "তোমাদের ওই বাবা ভদ্রলোকের নাম কেমন করে ঈশ্বরদাস হয়েছিল আমি বুঝতে পারি না। ঈশ্বরের যে দাস তার ওই চেহারা!"

চারুপ্রসাদ ভাইপোকে চিনতেন। দুঃখের বিষয়, কী কারণে যেন বরাবর বেশী রকম প্রশ্রয়ও দিয়ে এসেছেন। রাগ না করে বললেন, "ছবি দেখে মানুষ চেনা যায় না। তা ছাড়া নাম নামই। তোর নাম শমীক কেন?"

শমীক কাকার কথা শুনে হেসে মরে। বলল, "নামটা তো তুমিই দিয়েছিলে শুনেছি।"

"তোর বাবা দিতে বলল। আমাদের শচীর সঙ্গে মিলিয়ে শচীন দিতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দুটোই শচী-শচী হয়ে যাবে, তাই শমীক দিয়ে দিলাম। মানেটানে কি খুঁজতে গিয়েছি।"

শমীক বলল, "আমার নাম শমীকই হত, তুমি নিমিত্তমাত্র।

মহাভারত পড়েছ তো! মহারাজ পরীক্ষিত যার গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেই ঋষির নাম শমীক। আমি এখনকার শমীক, গলায় নাড়ি জড়িয়ে জন্মেছি। দেখো না, কী একটা কাণ্ড করি।"

চারুপ্রসাদ ঠাট্টার গলায় বললেন, "মহাভারতের শমীক কোনো কাণ্ড করে নি রে, করেছিল তার ছেলে। শমীক মুনি পরীক্ষিতকে ক্ষমাই করেছিল। ছেলে করে নি।"

শমীক বলল, "আমি কিন্তু করব না। কাণ্ড একটা করবই।"

চারুপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তোর কাণ্ড দেখেই যে মরব—তা জানি। যা, আর জ্বালাস না।"

শমীকের পারিবারিক ইতিহাসের যেটুকু জানা গেল তাতে অতীতের অংশটাই বেশী। বিগত দু পুরুষের কথা বাদ দিলে বাকি যে দু পুরুষ রয়েছে সেখানে শমীকের বাবা কাকা আর শমীকরা। দেবপ্রসাদ আর চারুপ্রসাদ যদিও বৈমাত্র ভাই তবু কোনো দিন সেটা স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। বোঝা গেল না, কারণ ঈশ্বরদাস যাকে মাতৃহীন রেখে গিয়েছিলেন, বছর চারেক বয়স থেকে মনোরমা তাকে নিজ সন্তানের মতন করে মানুষ করেছিলেন। চারুপ্রসাদ মনোরমার কোলে এসেছেন আরও বছর দুয়েক পরে। স্বামীগৃহে পা দিয়েই যাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাকে আর প্রত্যাখ্যান করেন নি। নিজের দুই সন্তানের—চারুপ্রসাদ আর গৌরীর—সমান করেই দেখেছেন দেবপ্রসাদকে। ঈশ্বরদাস অন্তত এই একটি জায়গায় অতিমাত্রায় দুর্বল ও শক্ত ছিলেন। দেবপ্রসাদকে কোনো সময়েই অনাদর সহ্য করতে হয় নি; মনোরমা জানতেন, স্বামী সেটা সহ্য করবেন না। তিনি নিজেও সে-চিন্তা কখনো করেন নি।

দেবপ্রসাদ এবং চারুপ্রসাদ তাই আজও সেই আজন্মের বাড়িতে একই সঙ্গে থেকে গেলেন। একান্নবর্তী পরিবারের অংশ হয়ে। দেবপ্রসাদের দুই সন্তান, শচী আর শমীক। শচীর বিয়ে হয়ে গেছে

কোন কালে, এখন তার বয়েস প্রায় চল্লিশ হতে চলল। চারুপ্রসাদের তিন সন্তান, বড়টি ছেলে, ছোট ছুটি মেয়ে। ছেলে শমীকের চেয়ে বয়েসে বড়, নাম অমৃত, মেয়ে ছুটির মধ্যে বড়টি—পুরবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে বছর চারেক হল, ছোটটি শমীকের শিষ্যা হয়ে পড়েছে অনেকদিন ধরেই। শমীক তার মাথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জ্ঞানের শস্য ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দেবপ্রসাদ এখন প্রবীণত্বের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁকে বৃদ্ধই বলা যায়। সরকারী চাকরি থেকে বিদায় নিয়েছেন অনেকদিন। চারুপ্রসাদ দাদার তুলনায় কম বৃদ্ধ। তাঁকে হয়ত প্রবীণই বলা চলে। ওকালতিতে অবসর বলে কিছু নেই—চারুপ্রসাদ তাই নিশ্চিন্ত।

দেবপ্রসাদের স্ত্রী আশালতা ইদানীং শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। কেন যে এই কষ্ট তিনি জানেন না, বুঝতে পারেন না। কখনো কখনো তাঁর মনে হয় শমীকের জন্মসময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে যেতে যেতে এই রোগটা একসময়ে দেখা দেয়। তখন বছরে দু-একবার আসত যেত, অতটা বুঝতে পারতেন না। আজ সাতাশ-আঠাশ বছরে সেটা ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে এখন পাকাপাকিভাবে ধরেছে। আশা-লতাকে মাঝে মাঝেই শয্যাশায়ী থাকতে হয়। সংসার চলে ছোট জা ইন্দুর দেখাশোনায়। ইন্দু বা ইন্দুলেখাও ইদানীং আশালতাকে বলেন, 'দিদি, আমারও আজকাল বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। এক একদিন রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়।' আশালতা ধমক দিয়ে বলেন, 'চুপ কর, সেদিনকার ছুঁড়ি, তোর আবার বুকে ব্যথা। অম্বলটম্বল হচ্ছে তোর, একটু করে সোডা খেয়ে দেখিস, সব সেরে যাবে।'

ইন্দুলেখা হেসে মরেন। তিনি নাকি সেদিনকার ছুঁড়ি। দেখতে দেখতে বয়েস যে হেলে পড়ল—দিদি সেটা দেখেও দেখবে না। ইন্দুলেখা ভাশুরঝির বিয়ে দিয়েছেন, নিজের বড় মেয়ের বিয়ে

দিয়েছেন, মাথায় কাপড় তুলে সারাক্ষণ থাকতে হয়—তবু তিনি নাকি ছুঁড়ি।

অবশ্য এ-বাড়ির এই ভাষা। শ্বশুর-শাশুড়ীর দৌলতে সেকেলে ভাষার সবটাই তাঁদের ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল, হালফিল ছেলেমেয়েদের রাগারাগির জন্যে তার অনেক কথাই জিবের ডগায় এসেও আবার গলায় ফিরে যায়। অনেক সময় যায়ও না, যেতে দিতে মনও চায় না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়ার গলা করে বলেন, "তোরা থাম, আমাদের মুখ আমাদের, তোদের নাকি? আমরা যা শিখেছি বলব, তোরা আর শিক্ষা দিতে আসিস না। তোদের কানে কতই দেখছি...।"

শমীক হেসে হেসে বলে, "কাকি, বাবা এখনও ওয়েলিংটন স্কোয়ারকে বলবে গোলপুকুর, কাকা নীলরতনকে বলবে ক্যাম্বেল হাসপাতাল, মা বলে খেলুম গেলুম, তুমি বরাবর হাঁসপাতাল আর রিশ্‌কা বলে চালিয়ে গেলে। এসব অচল পয়সা আর চলবে না।"

ইন্দুলেখা বলেন, "আমরাই তো তোদের কাছে অচল হয়ে গেলুম বে। আমাদের ফেলে দে, আর কি!"

শমীক জিব কেটে শব্দ করে; বলে, "ছি ছি, ফেলব কেন, তোমাদের একপাশে ভাঙা চেয়ারে বসিয়ে রাখব।"

"আর তোরা মুখপোড়ারা সব ভাঙবি?"

"আমরা মানে আমি, আমায় বলতে পার। আমি সত্যি-সত্যিই সব ভাঙব। ভাঙার জন্যে আমার জন্ম।"

শমীকের শিষ্যা করবী হেসে বলল, "ছোড়দা, আমাকে নিবি না, তোর ভাঙা জিনিস কুড়োবে কে?"

ইন্দুলেখা নকল ধমক দিয়ে বললেন, "যেমন গোঁসাই তার তেমন গুপি—আছিস বেশ।"

সকলেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

শমীক যে সত্যি-সত্যিই ভাঙার জন্যে জন্মেছে বাড়ির লোক তা বিশ্বাস করত না। তেমন কোনো স্পষ্ট লক্ষণও চোখে পড়ে নি। দু-দশটা সাজানো-গোছানো কথা বললেই লোকে কালাপাহাড় হয় না। শমীকের স্বভাবে ও-রকম কিছু দেখা যেত না। বাড়ির লোক জানত ছেলেটা খানিকটা খেয়ালী ধরনের, খানিকটা বা জেদী ; মাথায় ঝোঁক চাপলে অবাক অবাক কাণ্ড করে, হয়ত কখনো কখনো বাড়াবাড়ি কিছু করে ফেলে। বাড়িতে নানা তরফের প্রশ্রয় তাকে যে খানিকটা অকালপক্ক করে তুলেছে তাও স্বীকার করা যায়, কিন্তু সে কালাপাহাড় হয়ে উঠবে—একথা বিশ্বাস করা যায় না।

শমীকের বন্ধুরাও তাকে ভাল করে চিনত। জানত, শমীক কথা বলার একটা ঢঙ তৈরী করে নিয়েছে। তার কথার মধ্যে ধ্বনির প্রাবল্য যত অর্থের গভীরতা তত নেই। সে খানিকটা আলংকারিক। কিন্তু এই অলংকার প্রয়োগের সময় এমন একটা আবেগ কিংবা উত্তাপ সে যোগ করে দিতে পারত যে অলংকারটা যেন ঠিকরে উঠত। শমীক কৃত্রিম হল না শুধু এই কারণে। তাছাড়া শমীককে ভাল লাগার অন্য গুণও ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে তার মেলামেশা ছিল আন্তরিক। সে প্রীতির সম্পর্ক রাখতে শিখেছিল। যে-কোনো আপদে-বিপদে শমীককে পাওয়া যেত সর্বাগ্রে, অন্যের সুখ সে ঈর্ষাহীনভাবে গ্রহণ করতে পারত।

বন্ধুরা শমীককে দেখত আর ভাবত, যার শরীর-স্বাস্থ্য এত পলকা, মাথায় খাটো নয় বলে কোনো রকমে মানিয়ে গিয়েছে, তার পক্ষে ভাঙাভাঙির কাজ সম্ভব নয়।

শরীর-স্বাস্থ্য পলকা হলেও দেখতে শমীক চমৎকার ছিল। ধবধবে ফরসা রঙ, ছোট অথচ মেয়েলী মুখ, টিকোলো নাক, উজ্জ্বল দুটি চোখ, পরিপাটি দাঁত, পাতলা থুতনি। ওর গায়ে সাধারণ মেদ পর্যন্ত ছিল না, হাতের শিরা-উপশিরা ফুলে থাকত। ডান হাতের খুঁত ছিল সামান্য, নজর করে না দেখলে বোঝা যেত না।

শমীকের চেহারায় স্বাস্থ্য ছিল না, আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণ তার খানিকটা গঠনগত, খানিকটা স্বভাবগত। তার সরল হাসি, সকৌতুক দৃষ্টি, কেমন একটা সজীব দীপ্তি তাকে চোখে ধরিয়ে দিত।

বন্ধুরা যেমন শমীককে কোনো দিনই সর্বনাশ বলে মনে করে নি—সেই রকমই কখনো কখনো তার অদ্ভুত সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। হয়ত তাকে সাহস বলা যায় না, বলা যায় হঠকারিতা। এ-রকম হঠকারিতা শমীক অনেকবার করেছে। কোথায় কি করা উচিত না বুঝেই। তার বন্ধুরাও বিপদে পড়ে গিয়েছে। যেমন, কিছুদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। শমীক আর তার বন্ধুবান্ধবরা গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে বেড়াতে, ফেরার সময় বহরমপুর স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে দেখা গেল, মলিন গেরুয়া-পরা এক সাধুগোছের লোককে পাশের কামরা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে জনা কয়েক মদ্দ তাকে চড় চাপড় ঘুঁষি মারছে তো মেরেই যাচ্ছে। জুতো-পেটাও চলছিল। একটা বাচ্চা মেয়ে ওই হুলুস্থুলের মধ্যে লোকটাকে বাঁচাবার জন্যে এর ওর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে, আর কাঁদছে।

স্টেশনের ওই দিকটায় প্লাটফর্মে ভিড় জমে গেল। গাড়ি ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। অনেকের মতন শমীকরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিল।

দেখতে গিয়ে শুনল, ওই লোকটা নাকি এক মহিলার গয়না চুরি করেছে। মানুষটাকে দেখলে চোর মনে হবার কোনো কারণ নেই। গ্রাম্য, সরল, নির্বোধ মুখ। স্বাস্থ্য দুর্বল। বছর চল্লিশ বয়স অন্তত। অতগুলো লোকের চড় চাপড় ঘুঁষি লাথি খাচ্ছে আর হাত জোড় করে হাজার রকম মিনতি জানাচ্ছে বেচারী। তার কপাল কেটেছে, নাক ভেঙেছে, ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে গলগল করে, গায়ের জামাটা ছিঁড়েখুঁড়ে ঝুলছে। লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

শমীকের মাথায় যেন দপ করে আগুন ধরে গেল। হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল খেপার মতন। দেখলে মনে

হবে, কোথা থেকে যেন আচমকা এক ঝোড়ো ঘূর্ণি এসে পড়েছে। কী যে অদ্ভুত কাণ্ড করল শমীক কেউ বুঝল না। হাতটাত ছুঁড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বলল, 'ওকে আর যদি মারধোর করেন খুব বিপদে পড়বেন। আমি সব ক'টাকে পুলিসে নিয়ে যাব। ও চোর নয়। আপনারা চোর।'

শমীকই হয়ত মার খেতে পারত, কিন্তু তার বন্ধুরা ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অশোক আর মানু তাদের ধারবেল করা স্বাস্থ্য নিয়ে শমীকের দু পাশে।

কথা কাটাকাটি আর চেঁচামেচির মধ্যে ঘটনাটা জানা গেল। এক মহিলা বাথরুম যাবার সময় তাঁর গলার হার হারিয়ে ফেলেছিলেন, পরে যখন খেয়াল হল তখন তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করলেন। খোঁজাখুঁজির সময় দেখা গেল, ওই সাধু গোছের লোকটির বসার জায়গায় সাধুর তলায় হারটা পড়ে আছে। সেই মুহূর্তে সাব্যস্ত হয়ে গেল, লোকটা চোর। কেউ একবারও খেয়াল করল না, মহিলার গলার হারের আংটাটা আলগা, সেটা পড়ে যেতেও পারে। মহিলাও প্রথমে বলেন নি যখন বললেন, তখন বেচারী দীনদরিদ্র সাধুটির অনেকটা রক্ত অকারণে নষ্ট হয়ে গেছে।

শমীক বলেছিল, 'এই হল আমাদের দেশের মানুষ, ভাক হুজুগে, হতচ্ছাড়া। পশু যত। ধেড়ে শয়তানের দল সব। আমি এদের সর্বনাশ করব।'

শমীকের এই হঠকারিতা নিশ্চয় তার সর্বনাশ-সঙ্কল্পের প্রস্তাবনা নয়। তবু এই ধরনের ব্যাপারেই তার বন্ধুদের কিছু চিন্তা ছিল। আছে আছে বেশ আছে শমীক, হঠাৎ সে কেন যে খেপে উঠত তারা বুঝত না। আর ও যখন খেপে উঠত তখন তাকে অন্য রকম লাগত। মনে হত, কালবৈশাখীর ঝড়-ওঠা ঘুটঘুটে কালো আকাশে মেঘ-চেরা বিদ্যুতের মতন হঠাৎ যেন সে ঝলসে উঠছে। তখন তার ভয়ংকরত্ব ওদের আতঙ্কিত করত; ভাবত, একটা অঘটন না ঘটে যায়!

বাড়িতেও শমীকের এই চেহারা কারও অদেখা ছিল না। কিন্তু তা নিয়ে বড় কেউ ব্যস্ত হয়ে উঠত না। এক আশালতাই যা মনে মনে শঙ্কা বোধ করতেন—স্বামীকে বলতেন, 'ও কি ওর ছোটঠাকুরমার মতন পাগল হবে নাকি?' দেবপ্রসাদ বলতেন, 'কি জানি! বংশের ধাবা, হতেও পারে।' আশালতা ভাবতেন, দেখতে দেখতে শমীকের বয়েস সাতাশ-আঠাশ হয়ে এল, কতদিন আর খেপামি করে বেড়াবে! এবার তার মতিগতি ভাল হয়ে যাওয়া উচিত।

আশালতা মাঝেসাঝে ছেলেকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন, "শমী, তোর বয়েস কমছে না বাড়ছে?"

"কেন?"

"তোর পাগলামি আমার ভাল লাগে না।"

"দূর, তুমি আমার ছোট ছোট পাগলামিতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ, আসলটাই এখনও দেখলে না।" শমীক হাসতে হাসতে জবাব দিত।

"আমি আর দেখতে চাই না।"

"কিন্তু আমার যে না দেখিয়ে উপায় নেই—" শমীক ছেলেমানুষের মতন দু হাতে আশালতাকে জড়িয়ে কাঁধের কাছে মুখ ঘষতে ঘষতে সোহাগ করে বলত, "আমার বড় পাগলামিটা তোমাদের দেখতেই হবে।"

ছেলেকে গায়ের কাছ থেকে সরিয়ে না দিয়ে তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আশালতা বলতেন, "অনেক বড় হয়েছিস, আর না; এবার খেয়াল-খুশি ছাড়। তোর কাকার সঙ্গে কোর্টে যেতে শুরু কর। নিজের জীবনটার দিকে তাকা—।"

"সব সময় তাকাচ্ছি। যতই তাকাচ্ছি—ততই মনে হচ্ছে—আমার সময় হয়ে এসেছে। একবার সেই মুহূর্তটা এসে পড়ুক তারপর দেখবে। সর্বনাশ আমি করবই।"

আশালতা আর কিছু বলতে পারতেন না।

দুই

শমীক যাকে সময় বলত তার সেই সময় শেষ পর্যন্ত এল। এটা তার জন্মলগ্নের বিশেষ বিশেষ গ্রহের জটিল কোনো যোগাযোগের জন্যে কিনা বলা মুশকিল। বরং বলা যায়, জীবনে অনেক ঘটনা যেমন আচমকা ঘটে যায়—এটাও সেই রকম ঘটনা; অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অদ্ভুত কিছু নয়।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল সাধারণভাবে, একেবারে মামুলি প্রস্তাবনা। শমীকের বান্ধবী মৃদুলা তাকে চৌরঙ্গিপাড়ায় কী একটা বিখ্যাত বিদেশী ছবি দেখার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। মেয়েদের স্বভাব হল, তারা হাতে ঘড়ি বাঁধে কিন্তু কাঁটার দিকে চোখ রাখে না। মৃদুলা তার ব্যতিক্রম নয়।

মৃদুলার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে শমীক নিতান্তই সময় কাটানোর জন্যে সামনের বইয়ের স্টলে বই দেখছিল। লেখাপড়া জিনিসটা তার ধাতে সয় না। বলে, মগজ জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবার জন্যে দেদার লোক উঁচিয়ে আছে, কদিন আগেও ইনসিওরেন্সের দালালেরা যেমন যে যার কোম্পানির ক্লায়েন্ট ধরার জন্যে লোকের পেছন পেছন ঘুরত, এরাও সেই রকম। জীবনে একগোটা বই যথেষ্ট। হানড্রেড বেস্ট বুকস, তোর মগজ ঠিক থাকবে।

মগজ রক্ষায় যার এত যত্ন সেই শমীকই বইয়ের স্টলে দাঁড়িয়ে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে দোকানের একেবারে পেছনে ধুলোভরা মলাট-ছেঁড়া পুরোনো বইয়ের গাদা থেকে একটা বই আচমকা পেয়ে গেল। অখ্যাত লেখক, অপরিজ্ঞাত গ্রন্থ। বইয়ের নামটাই শমীককে টেনেছিল প্রথমে: 'দিস ইজ ফর মাইসেলফ।'

বইটা হাতে তুলে পাতা ওলটাতেই শমীক আরও একটা নাম

দেখল। সাব-টাইটেল। 'এ রুম উইদাউট ডোরস'। মলাটের অবস্থা শোচনীয়, পাতাগুলো ধুলোয় ময়লায় জলের দাগে বিবর্ণ। শমীক বইয়ের প্রথমটা দেখল, এলোমেলো পাতা উলটে গেল, তারপর কোথায় যেন কৌতূহল বোধ করে যৎসামান্য দামে কিনে ফেলল।

মৃদুলা এল অনেক দেরি করে। এসে অপরাধীর মতন মুখ করে বলল, "বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেছে'। টিকিট দুটো হারিয়ে ফেলেছি। আমার ব্যাগে ছিল, কোথায় যে কাগজপত্রের সঙ্গে ফেলে দিলাম. না হারিয়ে গেল -?"

শমীক হেসে বলল, "সত্যি সত্যি কেটেছিলি টিকিট?"

"বাঃ, কত হাতে-পায়ে ধরে বাচ্চুদাকে দিয়ে কাটিয়েছিলাম। এই ছবির জন্যে কী হুড়োহুড়ি, টিকিট পাওয়া যায় না। সত্যি আমার যা খারাপ লাগছে।"

শমীক বিন্দুমাত্র আপসোস না করে বলল, "ছেড়ে দে, তোর আর খারাপ লেগে দরকার নেই। চল্‌, কোথাও গিয়ে বসে দু কাপ চা খাই, তারপর দেখা যাবে—।"

শমীকের সঙ্গে মৃদুলা হাঁটতে লাগল। তখনও তার মন খুঁতখুঁত করছে। বাচ্চুদাকে দিয়ে তিন দিন আগে সে কিভাবে টিকিট কাটিয়েছিল, টিকিট দুটো যক্ষের ধনের মতন কেমনভাবে তার ব্যাগে রেখেছিল, তারপর টুকিটাকি দু-চারটে কাগজপত্র—যেমন কানাডা থেকে লেখা তার মামাতো বোন রুমির চিঠি, শালকরের কাছে কাচতে দেওয়া দুটো সিল্কের শাড়ির রসিদ, স্টেটসম্যান থেকে কাটা একটা চাকরির বিজ্ঞাপন, আলমারির চাবি, রুমাল—এইসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে বেখেয়ালে কখন টিকিট দুটো হারিয়ে ফেলেছে—মৃদুলা তার বৃত্তান্ত দিচ্ছিল।

"বাড়ি থেকে বেরোনার সময় কী গরুখোঁজাই করলাম, টেবিল বিছানা লণ্ডভণ্ড। মার সঙ্গে ঝগড়াও হয়ে গেল," মৃদুলা বলল,

"আমি তো বেশ বুঝতে পারছি, আমার এত দেরি দেখে তুই চটে যাচ্ছিস। কী করব, বল!"

শমীক বলল, "তুই দেরি করে ভালই করেছিস। সিনেমা দেখার ইচ্ছে আমার বড় ছিল না। তোকে দেখার জন্যেই সিনেমা দেখা।" হাসল শমীক, তারপর বলল, "তুই দেরি করলি বলে আমি একটা রত্ন উদ্ধার করে ফেললাম।"

"রত্ন?"

"বড় বড় লোকেরা যা বলে মাঝেমাঝে তা শুনতে হয়--বুঝলি, মৃদু। জানিস তো, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। আমি এই অমূল্য রতনটি উদ্ধার করলাম।" বলে শমীক হাতের বইটা মৃদুলার চোখের সামনে নাচাতে লাগল।

মৃদুলা বোকার মতন বলল, "বই?"

"দিস ইজ ফর মাইসেলফ," শমীক মজার গলায় বলল, "মনে হচ্ছে, এটা রত্ন হতেও পারে। বাড়িতে গিয়ে পরখ করব।"

মৃদুলা বলল, "তাই করিস।"

চায়ের দোকানে চা খাবার সময় মৃদুলা লক্ষ করল, শমীক বার বার হাতের বইটা দেখছে, এলোমেলো পাতা ওলটাচ্ছে, আধখাপচা করে পড়ছে। তার চোখেমুখে প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল দুইই যেন ফুটে উঠছিল।

মৃদুলা বলল, "তুই কি এখন ওই বই মুখে করে বসে থাকবি?"

শমীক মুখ তুলল। "কেন?"

"তাই তো দেখছি। বই রাখ, বাড়ি গিয়ে দেখবি।"

"ঠিক বলেছিস। এখন তোকে দেখি—" শমীক যেন ভুল শুধরে নিচ্ছে এমন একটা মজার ভঙ্গি করে বলল, চোখেমুখে হাসি। মৃদুলাকে বাস্তবিকই নিবিষ্ট চোখ করে দেখল দু মুহূর্ত, তারপর বলল, "তোর মুখটা একটু ফোলা ফোলা লাগছে, স্বাস্থ্য করছিস নাকতলায় গিয়ে?"

"বাজে বকিস না! বৃষ্টিতে ভিজে চারদিন জ্বরে ভুগলাম।"

"কবে তোর একদিন হাঁচিকাশি হয়েছিল এখনও সেটা চালিয়ে যাচ্ছিস? চালা—চালিয়ে যা।"

মৃদুলা চায়ের চামচটা তুলে নিয়ে শমীকের হাতের আঙুলের ওপর ঠক্ করে মারল। "একশো তিন পর্যন্ত জ্বর হয়েছিল তা জানিস?"

শমীক নিরীহের মতন মুখ করে বলল, "ফোনে বলেছিলি একশো চার পাঁচ—! যাক্, তোর জ্বরটা এখন কমছে। সুলক্ষণ।"

চায়ের দোকানের কেবিন নয় বলে শমীক সে-যাত্রায় বেঁচে গেল, নয়ত মৃদুলা হয়ত কাপের গরম চা তার গায়ে ছুঁড়ে দিত। কটাক্ষ করে মৃদুলা বলল, "তুই তো এখন সবই সুলক্ষণ দেখছিস। পাড়া ছেড়ে আমি চলে গিয়েছি কোন দূরে—নাকতলায়, এটাও সুলক্ষণ. তোর কত সময় বেচে যাচ্ছে। তারপর ধর, আগে দরকার পড়লে তোর বাড়ি বয়ে গিয়ে কিছু বলে আসতাম, এখন তোকে একটা ফোন করতে বাইরে বেরিয়ে ওষুধের দোকানে ছুটতে হয়। কাজেই [illegible] ঝামেলাটাও গেল; তুইও বেঁচে গেলি!"

শমীক হেসে ফেলে বলল, "তুই না কোথায়—লণ্ডন-ফণ্ডন যাবার চেষ্টা করছিলি? কতদূর হল?"

মৃদুলা রাগ করে বলল, "তোর চোখের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমোতে পারছিস না?"

"কী যে বলিস মৃদু, তুই আমার—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই-। ব্যাপারটা বোঝ। বুড়োর দারুণ রস ছিল।"

লোকের চোখ এড়িয়ে মৃদুলা জিব বের করে ভেঙাচ কাটল। বেঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, "সকলের সব আছে; তোরই যা কিছু নেই।"

শমীক হাসতে লাগল। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, "আমার মধ্যে কী আছে দেখতে পাবি ভাই, ওয়েট কর।"

চা শেষ করে মৃদুলা বলল, "চল্—ওঠ। কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।"

শমীক মাথা হেলিয়ে বলল, "চল···।"

ট্রাম লাইনের গা দিয়ে মেঠো পথ ধরে দুজনে হাঁটছিল। কলকাতায় এখনও বর্ষার রেশ। আশ্বিনের বাতাস সজল গন্ধ ছড়াচ্ছে। আকাশে বর্ষণের কোনো লক্ষণ অবশ্য চোখে পড়ছিল না। নিয়নের আলো কোথাও কোথাও শূন্যের চারপাশ উজ্জ্বল রূপালী করে রেখেছে।

হাঁটতে হাঁটতে মৃদুলা বলল, "আমার চাকরিটা এবার যাবে বুঝলি?"

"কেন?"

"অফিস তুলে দিচ্ছে"

"মানে?"

"বলছে, কলকাতায় শুধু ছোট একটা এস্টাবলিশমেন্ট রাখবে। বোম্বাইয়ের অফিসটাতেই কাজকর্ম যা করার করবে। কলকাতায় বিজনেস নেই, অকারণ এতগুলো লোক পুষে কী লাভ।·· দূর, মন-মেজাজ এত খারাপ যে দুদিন অফিসেই যাই নি।"

"তুই তা হলে বোম্বাই চলে যা। ডাঁটে থাকবি। রাজেশ খান্না দেখবি।"

মৃদুলা হাতের ব্যাগ দিয়ে শমীকের পিঠে মারল। "তুই আমায় যতই তাড়াতে চাস, আমি নড়ছি না।"

হেসে ফেলে শমীক বলল, "তুই নিজেই আরও কত দূরে লণ্ডন যাবার কথা বলেছিলি।"

"বলেছিলাম কি সাধে। এখানে ভাল চাকরি আমাদের মতন শাকচচ্চড়ি খাওয়া মেয়েরা আর পাবে না। কোনো রকম একটা ট্রেনিং যদি বাইরে থেকে নিয়ে আসতে পারি—এখানে ঠিক একটা জুটে যাবে। দময়ন্তীকে দেখ না—, বছর দেড়েক কী একটা মাথামুণ্ডু করে এল, এখন হোটেলে কত বড় চাকরি করছে।"

শমীক বাতাস বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল। সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে বলল, "তাই তো বলছি--তুই লণ্ডনে না যাস নিদেনপক্ষে বোম্বাইটা ঘুরে আয়। বোম্বাইঅলারও একটা প্রেস্টিজ আছে রে।"

মৃদুলা কথাটায় কান দিল না; আপনমনেই বলল, "এদিকে নাকতলায় বাড়ি করতে গিয়ে বাবার তো যা ছিল সবই শেষ; দাদা বেচারীকে সেই যে কলকাতা থেকে টেনে নিয়ে গেল, আর ফেরাবার নাম করে না। ছেলে-বউ নিয়ে বাঙালীর ছেলে আর কতদিন জয়পুরে পড়ে থাকবে বল। যাচ্ছেতাই চাকরি বাবা জিয়োলজিকাল সার্ভের। দাদা জয়পুরে, আমরা কলকাতায়—টুকরো টুকরো কত সংসার টানতে পারে মানুষ।"

শমীক সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, "তোর এত প্রবলেমের কোনো সল্যুশান নেই বেস্ট হল, তুই এই মোমেণ্টে একটা বিয়ে করে ফেল। ঝামেলা চুকে যাবে।"

মৃদুলা ঘাড় ফিরিয়ে শমীকের সহজ সরল সহাস্য মুখ দেখতে দেখতে শেষে বলল, "তাই করব।"

শমীক মৃদুলার দিকে তাকাল না। না তাকিয়েও মৃদুলার গলার স্বর থেকে অনুভব করতে পারল, ও যেন সামান্য গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাতই হয়ে গেল শমীকের। ন'টা বাজল প্রায়। বাড়ি এসে শুনল, দিদি এসেছিল সোনাকে সঙ্গে করে। দিদির চোখের ওপর আঁচিলটা বড় হয়ে যাচ্ছে বলে ওটা অপারেশান করিয়ে নেবে। আঁচিল থেকে নাকি ক্যানসার হয়ে যাবার ভয় থাকে। ডাক্তাররা ভয় দেখাচ্ছে। মামাও অবশ্য বলেছে, অতই যদি তোর ভয় কাটিয়ে নে। দিদি দু-চার দিনের মধ্যেই আঁচিল কাটাবে।

দিদির আঁচিলের কথায় শমীকের মৃদুলার মুখ মনে পড়ে গেল।

মৃদুলার ওপর-ঠোঁটে নাকের তলার দিকে মটরদানার মতন একটা আঁচিল আছে। আঁচিলটা মৃদুলার বড় আদরের, শমীকরা ঠাট্টা করলে রেগে গিয়ে সে বলে—'বেশ করি রঙ করে করে বড় করি, ওটা আমার বিউটি স্পট আমার মুখে যাই থাক—তোদের কী!'

বাথরুমে যাবার সময় শমীক হঠাৎ কেমন আপন মনেই হেসে উঠল, মনে মনে বলল, 'তোর ওই আদরের আঁচিলটা কাটিয়ে ফেল মৃদু, ক্যানসার হয়ে মরে যাবি।'

স্নান সেরে ফিরে এসে মন-মেজাজ ঝরঝরে করে শমীক কিনে-আনা বইটা নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল শুয়ে পড়ার পর তার মনে হল, সেই বিকেল থেকেই এই বইটা তার মনের তলায় কেমন একটা কৌতূহল সৃষ্টি করছিল মৃদুলার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার সময় তার মন মাঝে মাঝেই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, পুরোপুরি মৃদুলার দিকে ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে সে যত না মৃদুলার কথা শুনছিল তার চেয়ে বেশী এই বইটার কথা ভাবছিল মানে, থেকে থেকেই বইটার কথা মনে পড়ছিল, পেছনের মলাটে ছাপা অতি-ধূসর ছবিটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছিল মনে মনে নামটা আউড়ে যাচ্ছিল শমীক: লোরেনজো, লোরেনজো অন্যদিন হলে মৃদুলার সঙ্গে আরও রগড় করা যেত, খেপানো যেত, গল্প করতে পারত। আজ তার মন অতটা স্বাভাবিক ছিল না, খানিকটা চঞ্চল হয়ে পড়ছিল। যেন হাতে কোনো কাজ বাকি থেকে যাবার অস্বস্তি বোধ করছিল। মৃদুলা শেষ পর্যন্ত সেটা ধরতেও পেরেছিল, ধরতে পেরে বলেছিল—'তুই কি ভাবছিস রে?' শমীক যেন সামান্য লজ্জা পেয়ে জবাব দিয়েছিল, 'ভাবনার কি শেষ আছে, তোরই যখন অত ভাবনা, আমার তা হলে ভেবে দেখ কত ভাবনা। যাক গে, আর দেরি করিস না, বাদলা বাদলা হাওয়া দিচ্ছে, বৃষ্টি এসে পড়তে পারে। তুই কেটে পড়, আমি একদিন তোর কাছে যাব শিগ্গির।' বাদলার কোনো চিহ্ন নেই, তবু কেমন করে বৃষ্টি আসে মৃদুলা বুঝতে পারল না। আকাশে

তারা রয়েছে। এই আশ্বিনের বাতাসে মাঠেময়দানে সন্ধ্যেবেলায় বাদলার গন্ধ থাকবে—সেটা স্বাভাবিক, তা বলে বৃষ্টি আসবে কেন?

মৃদুলা শমীককে চেনে। বুঝতে পারল, বৃষ্টি আসার কথাটা ছুতো, আসলে শমীক বাড়ি ফিরে তার ওই বই নিয়ে বসার জন্যে ব্যস্ত।

মৃদুলা বলল, 'আসুক বৃষ্টি, আমি ভিজবো, তোর অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

শমীক হেসে উঠে বলল, 'ভিজলেই আবার তোর একশো চার হবে। দরকার কী? তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যা।'

কোনো সন্দেহ নেই খানিকটা রাগ করেই যেন মৃদুলা আরও একটু পরে বাড়ি ফেরার ট্রাম ধরল।

বই নিয়ে শমীক এখন আরাম করে শুয়ে প্রথম থেকে আবার বইটা দেখতে শুরু করল। উনিশশো আটত্রিশ সালের ছাপা বই মানে আটত্রিশ সালে বইটা গ্রেট বৃটেনে প্রথম ছাপা হয়। অনুবাদ বই, ইটালিয়ান ভাষা থেকে হেনরি ডিকসন নামের এক ভদ্রলোক ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। মূল বইটা ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের দু-চার বছর পরে যুদ্ধের শেষের দিকে বইটা হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে ওঠে, বার কয়েক সস্তা দামে ছাপাও হয়েছিল, তারপর যথারীতি ধুলোয় চাঁপা পড়ে গিয়েছে।

শমীক হিসেব করে দেখল, তার জন্মের ন'বছর আগে বইটা ইংরেজিতে ছাপা হয়েছিল। আর আসলটা তো আরও আগে।

প্রথম দিকের কয়েকটা পাতা মন দিয়ে পড়তে পড়তে শমীকের আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠল। সেলের মধ্যে বসে বসে পঁচিশ বছরের একটি ছেলে তার নিজের জীবনের কথা বলছে, এলোমেলো তুচ্ছ কথা নয়, তার কয়েদ-ঘরে আলো-বাতাস ঢোকে কি ঢোকে না— তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। সে বলছে: "ভয় এবং ভবিষ্যৎ জয় করার জন্যে আমার দু-তিনটে বছর কেটে গেল। আমার বন্ধুরা সকলেই মৃত, একমাত্র পিয়েো বেঁচে আছে, শুনেছি তার

আধখানা নাক নেই, একটা চোখ নেই, তার পুরুষাঙ্গ মরা বাদুড়ের মতন পেটের তলায় লেপটে আছে। পিরো তার গ্রামের বাড়িতে বুড়ী মা-র সঙ্গে গির্জার সামনে মোমবাতি ফেরি করে। এই পিরো, যাকে আমরা চিলের মতন ছোঁ মেরে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসতে দেখেছি, যে ভুলচুকের বাইরে অবিশ্বাস্যভাবে তার কাজ করে যেতে পারত, যার জীবন ছিল বীর্যের আর সম্ভোগের, সে আজ বিকৃতদর্শন একটা মাংসের ডেলা হয়ে মোমবাতি বেচছে শুনলে আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। পিরোর জীবনের এখন আর মূল্য কী? কেন আমার স্কোয়াড্রনের বন্ধুরা, যারা সকালের আলোয় প্রজাপতির মতন বাতাসে উড়ে বেড়াত, যারা বিকেলে ভূমধ্যসাগরের হাওয়া-খাওয়া পাখির মতন ডানা মেলে ভেসে থাকত, তারা—আমার সেই বন্ধুরা – একে একে মারা গেল? সেই বিষণ্ণ মুখের ছেলেটি, গিয়োভানি, যার পায়ের পাতায় ডানা বাঁধা থাকত, পকেটে মানজোনির কাব্য—সে কেন একদিন তার উড়োজাহাজ নিয়ে আকাশে উঠে যাবার পর আর কোনোদিন ফিরে এল না?··· যখন সবাই মৃত, পিরোও তার কফিনে শুয়ে থাকার মতন করে বেঁচে আছে—তখন আমার জীবিত থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। তবু আমি জীবিত থেকে গিয়েছি, সেলের কুঠরিতে বসে এই লেখার খসড়া করছি—কারণ আমার বিবেক বলেছে, গিয়োভানি, উগো, লুকানি—এরা আমার ঘাড়ে একটা দায়িত্ব চাপিয়ে গেছে। আমাদের শেষ কথাটা বলার জন্যে সবার পেছনে রেখে গেছে আমায়। কথাটা আমি কেমন করে বলব তা ওরা শিখিয়ে দিয়ে যায় নি, কেননা আমায় শেখানোর কিছু নেই। শুধু মনে মনে ওরা আমায় সম্মতি জানিয়ে গিয়েছে।···আমরা কিছু হয়ে উঠছিলাম এর প্রমাণ কোথাও নেই এটাই বড় কথা। আমরা কিছু বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম—অথচ আমাদের জীবনের চারপাশে বিশ্বাস রাখার মতন কিছুই ছিল না। গিয়োভানি যা বলত: 'যতক্ষণ আকাশে ততক্ষণ তোমার ওই

যন্ত্রটাকে বিশ্বাস করতে হয়, কিন্তু কোনো যন্ত্রই বিশ্বাসযোগ্য নয়'—আমাদের জীবনটাও সেই রকম। বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলিতে এই জীবন—যা আমাদের হাত-পা নাড়ার, মলমূত্র ত্যাগের স্বাধীনতাকে—জীবনের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ভেবে নিতে হয়। আসলে আমাদের পিতৃভূমি বলো, মুসোলিনী বলো, আমাদের মেসের উল্লুকমুখো বাঁধুনিটাকেই বলো—কিংবা নাচগান হইহল্লা, নেশা, মেয়েদের বিছানার ওপর শেয়ালের মতন শুয়ে থাকা, পোপের শুভবর্ষ বাণী—কোনো কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা যা ঘৃণা করতাম, সেই ঘৃণার মধ্যে বেঁচে ছিলাম, কেননা সমুদ্রে ডুবতে বসলে সেই অবস্থায় সাঁতার কাটার চেষ্টা না করে উপায় নেই, তার মানে এই নয় যে সমুদ্রকে আমি পছন্দ করেছি।... ..."

শমীক বইয়ের মধ্যে এতই ডুবে গিয়েছিল যে করবী এসে কখন পাশে দাঁড়িয়েছে বোঝে নি।

করবী আবার ডাকল, "এই ছোড়দা ?"

মুখের সামনে থেকে বই সরিয়ে শমীক তাকাল

"তোকে ডাকছি সাড়াই দিচ্ছিস না "

"শুনি নি।"

"খেতে যাবি না ? ওঠ।"

"ক'টা বাজল ?"

"দশটা।"

"একটু পরে যাব।"

"বারে, খাবার বেড়ে বসে আছে ওদিকে। সবাই বসে পড়েছে।"

শমীক ছোট বোনের দিকে তাকাল। "দাঁড়া, এই পাতাটা শেষ করে নি।"

"কী পড়ছিস ?"

"দারুণ একটা বই।"

"গল্প ?"

"আত্মজীবনী।"

করবী তেমন কোনো উৎসাহ দেখাল না। বলল, "খেয়ে এসে পড়বি। চল।"

শমীক বিরক্ত হবার ভান করে বলল, "তোরা খাওয়াটাকে এত ইম্‌পর্টেণ্ট মনে করিস কেন? না খেয়েও মানুষ এক-আধ বেলা বাঁচতে পারে।"

করবী হেসে বলল, "তোর বইটাও দশ পনেবো-মিনিট পরে পডা যায়।"

শমীক যেন বাধ্য হয়েই বইটা বালিশেব পাশে রেখে উঠে পড়ল। বলল, "বইটা সাংঘাতিক বে! দারুণ। পডতে পড়তে বুকের মধ্যে কেমন গুমগুম করে।"

"কী নাম?"

"দিস ইজ ফব মাইসেলফ। আবও একটা বাড়তি নাম আছে: এ রুম উইদাউট ডোরস...।" বিছানা থেকে নেমে পড়েছিল শমীক, করবীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, "এ রুম উইদাউট ডোরস-এর বাংলা কী হবে রে?"

"যে ঘরের দরজা নেই," করবী কিছু না ভেবেই বলল।

শমীক নাকমুখ কুঁচকে ছ্যা-ছ্যা ভাব কবে বলল, "তুই একেবারে বটতলা মার্কা বাংলা বললি। ভাল বাংলা বল।"

করবীর মাথায় ভাল বাংলা আসছিল না।

বাইরে এসে ঢাকা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শমীক উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, "সত্যি একটা জীবন, বুঝলি রুবি, ভেতরে কিছু পদার্থ আছে। তোদের মহর্ষিচরিত নয়।" বলে বোনকে সে কেমন করে বইটার অসাধারণত্ব বোঝাবে ঠিক করতে না পেরে আবেগের বশেই বলল, "মুসোলিনীর নাম শুনেছিস তো। হিটলারের গ্রেট ফ্রেণ্ড। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর আমলে ছেলেটা তাদের এয়ারফোর্সে ছিল। ওর সমস্ত ছেলেমানুষ বন্ধুরা একে একে মারা গেল। কেউ লড়তে

গিয়ে, কেউ প্লেন ভেঙে, কেউবা মরব বলেই যেন সমুদ্রে ঝাঁপ খেল। শুধু ও বেঁচে থাকল। তারপর একদিন রিভোল্ট করল—ব্যাস—যাবে কোথায়, কোর্ট মার্শাল, সোজা মিলিটারি জেলখানায়। সেলে বসে বসে নিজের কথা লিখেছিল। মাত্র দশ দিনের মধ্যে। মিলিটারিতে ঝটপট ট্রায়াল হয়ে গেল। দিন পনেরোর মধ্যেই লোরেনজোর ট্রায়াল শেষ। গুলি করে মেরে ফেলল বেচারীকে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস। আমার চেয়েও কম বয়সে মরে গেল।"

"মরে গেল!" করবী যেন সামান্য অবাক হল।

শমীক বলল, "মেরে ফেলল। মুসৌলিনীর রাজত্বে বসে তার বিরুদ্ধে কথা বলবে? এত বড় দুঃসাহস! না মেরে উপায় কী!… বইটাও মুসোলিনীর আমলে ব্যান্ ছিল।"

তিন

পরের দিন বইটা শেষ করল শমীক। শেষ করে বিহ্বল হয়ে বসে থাকল, নিঃশ্বাসের ভার তার বুকে ক্রমশই জমে উঠছিল। তারপর কখন একসময়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন সেই ভার আর সহ্য করতে না পেরে সামান্য স্বস্তি পাবার চেষ্টা করল। শরীরের কোনো কিছুই নড়ছিল না। একেবারে স্থির শান্ত। তার চোখের সামনে কেমন এক নিষ্প্রাণ ধূসর, শব্দহীন শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল; সময়ের গতি যেন এই কয়েকটি মুহূর্তে সহসা স্তব্ধ হয়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ শমীক আর কিছু অনুভব করতে পারল না। তারপর ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্নের মতন সে আবার লোরেনজোকে খুঁজে পেল। দেখল, লোরেনজো তার মিলিটারি কয়েদখানার ব্যারাক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সূর্যের আলোয় তার মাথার পাতলা চুল আরও রুক্ষ দেখাচ্ছে, ক'টা পায়রা উড়ে গেল তাদের পায়ের শব্দে,

লোরেনজোর পাশে পাশে সঙ্গিনধারী প্রহরীরা হেঁটে চলেছে, জুতোর শব্দ উঠছে পাথর-বাঁধানো বিশাল উঠোনে···।

এ সমস্তই শমীক কল্পনা করল। হয়ত অবিকল এই ভাবেই সমস্ত কিছু ঘটেছে। কিংবা কিছু অদলবদল ঘটে থাকতে পারে। তাতে কি আসে যায়। শেষ পর্যন্ত তো সেই একই পরিণতি। লোরেনজোকে চোখ বেঁধে গুলি করে মারা হল।

শমীক যেন স্পষ্টই সেই মৃত, ভূলুণ্ঠিত দেহটি দেখতে পায়, সেই ছেলেটিকে, যে তার লেখার শেষ দিকে শান্তভাবে বলেছে: 'আমাদের কিছু ছিল না, আমাদের কিছু থাকবে না; মৃত্যুই হবে যথার্থ স্বাধীনতা। সেই মুক্তি আমি প্রার্থনা করছি, আমার আর কোনো ভয় নেই।'

চোখে জল এল শমীকের। এই আবেগ সে দমন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না, শিশুর মতন কাঁদল। তার চোখের জলের জন্যে সে লজ্জিত নয়।

বাড়িটা এখন আশ্চর্য রকমের শান্ত। যেটুকু সাড়াশব্দ শোনা যায় তা যেন কানেও আসে না। জানলার গায়ে গায়ে রোদ সরে যাচ্ছে, বাইরে কতকালের পুরোনো এক জোড়া সাবু গাছ নির্বিকার দাঁড়িয়ে, শরতের রোদ পড়েছে মাথায়। কোন পাশে যে কয়েকটা চড়ুই ডাকাডাকি করে যাচ্ছে কে জানে!

প্রথম দিকের এই বিহ্বলতা কাটতে সময় লাগল, শেষে শমীক বইটা কোলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে উঠে পড়ল। নিজেকে সে সামলে নিয়েছে। হঠাৎ বড় অবসাদ লাগছে।

"রুবি," বাইরে এসে শমীক ডাকল, গলাটা নিজের কানেই ভারী ভারী শোনাল।

করবীর সাড়া পেল না শমীক। তাদের তেতলা বাড়ির ঘরের সংখ্যা এখন বেশী হয়ে পড়েছে, সে-অনুপাতে বাড়িতে লোক কম। হাঁকডাক করে না ডাকলে কেউ যেন শুনতেই পায় না। তার ওপর

বেলা মোটামুটি মন্দ নয় ; কাকা কোর্টে, দাদা তার কনভেন্ট্ রোডের কারখানায়, বাবা বোধ হয় স্নান শেষ করে নিজের ঘরের বারান্দায় ছায়ায় গিয়ে বসে আছেন, মা আর কাকিমা কোথায় বসে গল্প করছে কে জানে। অন্য কাউকেও চোখে পড়ছে না। কোথায় বৈকুণ্ঠ? কোথায় বা সুবর্ণাদি?

শমীক এবার আরও একটু গলা চড়িয়ে বোনকে ডাকল।

সাড়া পাওয়া গেল করবীর।

সামান্য পরেই বাঁ দিকের বারান্দার আড়াল থেকে করবী সামনে এল। কাছাকাছি এসে বলল, "ডাকছিস?"

"এই একটু চা খাওয়া," শমীক বলল।

"এখন চা খাবি?"

"কেন, কত বেলা—! নে, করে ফেল।"

শমীক আর দাঁড়াল না, নিজের ঘরে ফিরে এল।

ঘরে এসে যেন আর কিছু করার মতন খুঁজে না পেয়ে একটা সিগারেট ধরাল। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

দোতলার ডান দিক ঘেঁষে তার ঘর। পাশের ঘরটা দাদার। বাবা বাঁ দিকের পুব-দক্ষিণের ঘর-বারান্দা নিয়ে থাকেন। কাকা-কাকিমা তেতলায়।

এই বাড়িটার চেহারাই কেমন বিচিত্র, প্রায় তিন পাশ জুড়ে বারান্দা আর ঘর, মাঝখানটা ফাঁকা, একটা চৌবাচ্চার মতনই দেখায়। ঠিক কতকাল আগে এই বাড়ি কেনা বা তৈরী হয়েছিল তা অবশ্য শমীক সঠিক জানে না, শুনেছে—শ খানেক কি আরও একটু বেশী। তখনকার দিনে ঘরবাড়ির এই ধরন ছিল, ঢালাও করে ফেঁদে বসা, শ্রী-ছাঁদ কতটা থাকল আর না-থাকল কেউ গ্রাহ্য করত না, সে চোখও বোধ হয় ছিল না। শমীক শুনেছে ঠাকুরদার বাবা সাধাসিধে একটা এক কি দেড়তলা বাড়ি করেছিল। ঠাকুরদা সেই বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে বাড়িয়ে দোতলা তেতলা তুলেছিল। এই বাড়ির ভেতরের

যা-কিছু কারিকুরি—যেমন চীনেমাটির বাহারী টালি বসিয়ে দেওয়ালের তলার দিকটা-ঢেকে ফেলা, মেঝেতে শ্বেত পাথর বসানোর কারুকার্য, জানলার মাথায় কাঠের ঘোমটা যাকে নাকি কাশ্মীরী টপ্ বলে, বাড়ির মধ্যে গ্যাসের পাইপ—খড়খড়ি করা জানলার কাঠ, কাচের শার্সি—এ সবই ঠাকুরদার কীর্তি। মদ বেচে এই ঐশ্বর্য কেমন করে করেছিল লোকটা কে জানে। কিন্তু করেছিল।

বাড়ির কথা নয়, শমীক আপাতত বাড়িটার কথা ভাবছে না। অথচ সে অন্যমনস্ক। বাইরে যেটুকু সাদা মেঘ গা ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যতটা নীলচে আকাশ চোখে পড়ছে, আর সাবুগাছের মাথা সবুজ হয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, তার কোনো আশ্চর্য অভ্যন্তরে কেমন এক ঝাপসা আঁধার ফুটে আছে। সেই আঁধারে লোরেনজোর মুখ।

শমীকের ভাল লাগছিল না। কেন এমন হয়? কেন? কেন এই আশ্চর্য দুঃখ, নৈরাশ্য? কেন বুকের মধ্যে এত ভার জমে উঠছে? লোরেনজো তো তার কেউ নয়। শমীকের জন্মের অনেক আগেই যে ঘটনা ঘটে গেছে, যার সঙ্গে এই দেশের, এই সময়ের, এই সমাজের কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই—সেই ঘটনার জন্যে এত দুঃখ পাবার কী আছে? কেন এমন করে দুঃখটা নিজের হয়ে যায়।

সিগারেটটা প্রায় শেষ করে জানলা থেকে সরে এল শমীক। সরে এসে চেয়ারে বসে পড়ল। যেন মনের এই অবস্থাটা ভুলে থাকার জন্যে ঘরের চারপাশে অকারণে তাকাতে লাগল; পাখা দেখল। দেওয়ালের যেদিকটায় আলো এবং নরম ছায়ার জালি পড়েছে সেদিকে তাকিয়ে থাকল অন্যমনস্ক চোখে। দৃষ্টি সরিয়ে নিল। গোলাপী রঙের আলোর শেড্-এর মাথার ওপর ডিমের কুসুমের মতন এক ফোঁটা রোদ কেমন করে এসে পড়েছে। কেমন করে এল বোঝা যাচ্ছে না। গোল ঘুলঘুলি দিয়ে হয়ত।

করবী চা নিয়ে ঘরে এল।

"এই নে—"

শমীক হাত বাড়াল। হাত বাড়াবার সময় বুঝতে পারল সে অস্বাভাবিক শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

"তোকে একটা খবর দি," করবী বলল।

"কী?' শমীক তাকাল।

"ভবানীপুরেব সেই ভদ্রলোককে জেঠামণি চিঠি লিখেছেন।"

"কোন ভদ্রলোক?"

"দাদার হবু শ্বশুরকে," করবী হেসে বলল।

শমীক কিছু বলল না।

মাথার ভিজে চুল আঙুল দিয়ে পিঠের ওপর ছড়াতে ছড়াতে করবী বলল, 'অনেক দিন এ বাড়িতে হই-হুল্লোড হয় নি, অঘ্রান মাসে যদি দাদার বিয়েটা লেগে যায়, বুঝলি ছোড়দা, বাড়ি আবার গমগম করে উঠবে।"

শমীক বোনের দিকে তাকাল, তারপর আচমকা বলল, "হবে, এ বাড়িতে এবার কিছু একটা হবে···।"

কবরী বুঝতে পারল না। তাকিয়ে থাকল।

শমীক আবার চুপচাপ।

বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে কান পরিষ্কার করে নিল করবী। "তোকে অমন উসকোখুসকো দেখাচ্ছে কেন রে?"

শমীক প্রথমে জবাব দিল না, তারপর বলল, "এমনি।"

করবী আর একটু দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল, শমীক ডাকল, বলল, "আচ্ছা রুবি. এক-একটা বই কেন ভীষণ ভাল লাগে বলতে পারিস?"

এমন অদ্ভুত কথার কোনো অর্থ করবী বুঝল না, বলল, "ভাল বই হলে লাগতে পারে।"

"না," শমীক মাথা নাড়ল, "সব সময় তা নয়, ভাল বইও অনেক সময় ভাল লাগে না, পড়তে পড়তে বিরক্ত লাগে, হাই ওঠে। ব্যাপারটা আলাদা। আসলে এক-একটা বই মনের মধ্যে খুব সহজে

জায়গা করে নেয়। আমরা যা চাইছি, খুঁজছি, আশা করছি, ঠিক সময়ে যদি সেই বইটা পেয়ে যাই, যার মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি মনে হয়—তবে সেটা সাংঘাতিক ভাল লেগে যায়। আইডেন্টি-ফিকেসান্।"

করবী বলল, "তোর মাথায় এখনও বুঝি ওই বইটা ঘুরছে?"

শমীক বলল, "...এরকম অসাধারণ বই আমি আর পড়ি নি। কি রকম একটা লাগছে রুবি, মনের মধ্যে কেমন যেন হয়ে আছে।... তুই পড়বি।"

"আমি?"

"না পড়লে ব্যাপারটা বুঝবি না।"

করবী কিছু বলল না।

দুপুর বেলায় শমীক পুরোপুরি বইটা আর পড়ল না, মাঝে মাঝে পাতা খুলল, পড়ল। তার পছন্দমতন জায়গাগুলো আবার খুঁজে খুঁজে বের করল, মন দিয়ে পড়ল। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল, ব্যবধানটা বাস্তব কিন্তু মানসিক নয়। লোরেনজোকে যতটা দূরের মানুষ মনে করা যাচ্ছিল—ততটা দূরের মানুষ সে নয়। শমীকের সঙ্গে কোথায় যেন তার একাত্মতা রয়েছে। কোথায়? শমীক বাস্তবিকই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ সালের মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট রাজত্বে উপস্থিত ছিল না। সে লোরেনজোদের মতন আকাশে উড়ে বেড়াত না, বোমা ফেলতে শেখে নি, ঝাঁক ঝাঁক গুলি চালানোর শিক্ষাও তার ছিল না। জীবনটাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে এই দুঃসাহসী খেলার সে সঙ্গী হতে পারে নি। তবে কেন লোরেনজো আর গিয়োভানিরা তার নিজের হয়ে যাবে?

সাধারণ নিয়মে এটা হয় না, হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সাধারণ নিয়মের বাইরে হৃদয়ের, অনুভবের একটা নিজের নিয়ম আছে, সেই নিয়ম দেশ কাল ভাষা সংস্কার আচার আচরণ কিছুই মানে না। যদি

মানত তবে রামের চোদ্দ বছর বনবাসের জন্যে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলার কারণ থাকত না। কেনই বা কর্ণের সেই বিরাট দুঃখ বুকে এসে লাগে? কেন মনে পড়ে হ্যামলেটের কথা?

শমীক অনুভব করতে পারছিল; কোথাও কোনো একটা রহস্যময় মিল লোরেনজোর সঙ্গে তার থেকে যাচ্ছে। সেই মিল কোথায়? কোথায়?

"বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলি যদি ঘৃণার হয় তবে আমার চোখের সামনে কোনো নারী তার দেহের অতিরিক্ত কিছু হতে পারে না, কয়েকটা লিরার বদলে আমি কিছু ফুল পেতে পারি, আর আকণ্ঠ মদ্য-পানের পর জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে পারি, দেশের জন্য আমরা আত্মোৎসর্গ করছি। এর মধ্যে কোনোটাই সত্য নয়, না নারী না ফুলের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, না দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গ করার চিন্তা। সাহস এবং আত্মোৎসর্গ দুটোই মিথ্যে। অন্তত আমাদের কাছে। এ শুধু প্রলেপ দেবার চেষ্টা। আত্মোৎসর্গ কার জন্যে? কিসের জন্যে? এই শঠতার জন্যে? ওই কালো কুর্তা পরা উল্লুকগুলোর জন্যে? মুসোলিনীর পায়ের জুতো শক্ত রাখার জন্যে? আসলে আমাদের সমস্ত রকমের ঘৃণা, নিদারুণ বিতৃষ্ণাকে মোড় ফেরাবার জন্যে এই কৌশল। নাকের ওপর পাকা ফোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মতন আমরা একটা টনটনে জাতীয়তাবাদ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কারণ মুসোলিনী ফোড়াটা দেখতে চায় অথচ এই ফোড়াটা কৃত্রিম; ছালের ওপর গজিয়ে তোলা। উগো বলত, তার বাবা মাছেদের বিবেক নেই, মানুষের আছে—এই কথাটা প্রমাণ করার জন্যে দিস্তে দিস্তে কাগজ খরচ করেছিল। উগো তার বাবার কথা শোনাত, আর হেসে হেসে বলত: 'ওহে, আমরা মরুভূমিতে উটের মতন হেঁটে যাচ্ছি বুঝলে, গলার কাছে বিবেক ঝুলছে!' উগোর এই বিদ্রূপ আমাদের চমৎকার লাগত। কেননা আমরা বিবেককেও ঘৃণা করতে চাইতাম। জীবনের কোনটা কত মূল্যবান তা শেখাবার যে

চেষ্টা চলে এসেছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল। ম্যাজিকের তাসের মতন এই সব মূল্য চট্‌পট্‌ বদলে যায়, রুহিতন চিড়িতন হয়ে যায়, লাল হয়ে যায় কালো। মানবসমাজ এই খেলায় মেতে আছে। কেননা খেলাটা তারই সৃষ্টি। আমরা গোটা সৃষ্টিটাকেই ঘৃণা করতাম। ঘৃণা বিনা কোনো কিছুকেই যথার্থ করে চেনা যায় না।"

শমীক বইটা বুকের ওপব রেখে দিল। দিয়ে চোখ বন্ধ করল। তার বুকে কেমন আশ্চর্য এক বাতাস জমে যাচ্ছে। এই বাতাস হালকা নয়, শরৎকালের দুপুরের সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস নয়, অনেক ভারী—যেন ঝিম ধরানো কোনো উপাদান বাতাসে মেশানো আছে। হাত পা বুক সর্বত্রই কেমন এক কাঁপুনি উঠছিল. চেতনার একটা স্তরে জ্বালা, অন্য স্তরে বেদনা; দুটোই গায়ে গায়ে পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল, কোথায় যে, শমীক তা অনুভব করতে পারছিল না।

দুপুরটা এই ভাবেই কাটল। শমীক কখনো এই ধরনের শূন্যতা অনুভব করে নি। এত স্পৃষ্ট, গভীর নিঃসঙ্গতাও নয়

বিকেলে শমীক বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বসুধার বাড়ি চলে গেল।

বসুধা হাত ভেঙে বাড়িতে বসে আছে কদিন।

শমীক ঘরে ঢুকে বলল, "কী রে, কেমন আছিস?"

বসুধা তার হাত দেখাল। গলার সঙ্গে কাপড় ঝোলানো, বাঁ হাতটা ঝুলিয়ে রেখেছে কাপড়ে। হাতের আধখানা প্লাস্টার করা।

"ব্যথাটা কমে গেছে," বসুধা বলল, "প্রায় নেই। আঙুলগুলোও আর অতটা ফুলে নেই।"

শমীক অন্যমনস্কভাবে হেসে বলল, "ট্রামেবাসে ঝুলতে যাস কেন? বুড়ো বয়েসে ও কি আর পোষায়?"

"সাধ করে কি ঝুলি ভাই, ঝোলায়।"

"তা হলেও মনে রাখিস—কলকাতার এই ঝুলন-গাড়ি তোর মতন বুড়োর জন্যে নয়।"

বসুধা হেসে ফেলল। বয়সটা তার তিরিশ ছুঁয়েছে। শমীকের চেয়ে দু-তিন বছরের বড়ই হবে। তবু ছেলেবেলা থেকেই তারা বন্ধু। পারিবারিক একটা সম্পর্কও রয়েছে, বসুধার মা শমীকের দিদির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে মামী।

বসুধা বলল, "ঠিক বলেছিস, এত ভেজালের মধ্যে বয়েসটাও ঠিক রাখা যাচ্ছে না। বুড়োই হয়ে যাচ্ছি, হাফ-বুড়ো।"

শমীক কথা বলল না, বসুধার তামাটে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল: তার চওড়া ভুরুর তলায় দপদপে চোখ, সামান্য কটা। বসুধাকে বরাবরই পছন্দ করে এসেছে শমীক। বুদ্ধিটা ওর আছে; লেখাপড়ায় ভালর দলে ছিল, কলেজে কিছুদিন রাজনীতি করার ঝোঁক চেপেছিল, শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। কলেজে পড়াবার চাকরিও পেয়েছিল এম এ পাস করার পর, সেই চাকরিও মাস দুয়েক পুরো করে নি. একটা বড়-সড় বেসরকারী অফিসে চাকরি পেয়ে সেখানে চলে গেল। বিয়ের পর একটা না দুটো প্রমোসান পেয়ে বসুধা এখন বেশ গেরস্থ ছেলে হয়ে গিয়েছে।

শমীক বলল, "তোর দোলন কোথায়?"

"ওপরে।"

"ডাক্; চা করতে বল।"

"বলতে হবে না, তোর গলা আগেই ওপরে পৌঁছেচে।...চা আসছে।"

শমীক যেন আরও সহজ হবার জন্যে সোফার ওপর পা তুলে দিয়ে সামান্য বেঁকে আধশোয়া হয়ে বসল। "মেজাজটা আজ ভাল নেই, বুঝলি।"

"কেন? মেজাজের দোষ?"

শমীক চুপ করে থাকল। বসুধাদের নীচের তলার বসবার ঘরে পুরোনো এক গন্ধ রয়েছে। আসবাবপত্র পুরোনো, সোফা-সেটিগুলো সেকেলে সাহেববাড়ির। দেওয়াল ভরতি বড় বড় ছবি, বেশির ভাগই পাখির, বসুধার বাবা পাখির ব্যাপারে পণ্ডিত লোক ছিলেন। কাগজেপত্রে লেখালেখি করতেন। অথচ তিনি পেশা হিসেবে পক্ষীচর্চা গ্রহণ করেন নি।

শমীক ছাদের দিক মুখ কবে চুপচাপ কিছু ভাবল কিছুক্ষণ; তারপব বলল, "কাল একটা বই হাতে এসে গেল হঠাৎ, বুঝলি বসুধা; বইটা পড়ার পর থেকে কেমন হয়ে গিয়েছি, বিশ্বাস কর।"

"কা বই?" বসুধা জিজ্ঞেস করল।

শমীক গতকালেব ঘটনাটা বলল। তারপর বইয়ের কথা। লোরেনজো-কাহিনী বলাব সময় তাব মুগ্ধ অভিভূত ভাবটা এত স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে ফুটে উঠছিল যে বসুধা যেন সামান্য অবাক হয়েই বন্ধুকে দেখছিল।

বসুধার স্ত্রী দোলন চা নিয়ে এল। ছিপছিপে গড়নেব হাসিখুশী মুখেব মেয়ে দোলন। গলাব স্বর পাতলা, কথায় কথায় হাসে, তাব হাসিটাই ভয়ের, হাসতে হাসতে বিষম খেয়ে যায়।

চা দিল দোলন। চায়ের সঙ্গে হিঙের কচুরি, নিজেব হাতে ভেজে নিয়ে এসেছে। একটু বসল ঘরে। শমীকেব সঙ্গে সাধারণ কথা বলল, হাসিঠাট্টা করল, তারপব চলে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ঘরের বাতিটা জ্বলছিল।

শমীক বন্ধুর মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল, তারপর নিজেরটা ধরাল। বসুধার একেবারে সামনে মুখোমুখি বসে বলল, "তুই তো এন্তার বইটই পড়তিস এককালে, এটা পড়েছিস?"

"না। নামও শুনি নি।" বলে বসুধা একটু চুপ করে থেকে বলল, "একটা সময়ে এসপ্লানেডে গিয়ে বইয়ের দোকানে ঘুরে

বেড়াবার নেশা ছিল। দুমদাম কিনে ফেলতাম। এ-রকম কোনো বই তো চোখে পড়ে নি।"

"তোর কী মনে হচ্ছে?"

"আমার—" বসুধা কী বলবে ঠিক করতে না পেরে দু মুহূর্ত চুপ করে থাকল, পরে বলল, "সেকেণ্ড ওআর্লড ওআর নিয়ে লেখা অজস্র বই আছে। শয়ে শয়ে। তার মধ্যে যেগুলো খুব পপুলার হয়ে উঠত, তাব দু-দশটা আমাদের এখানে আসত, পকেট বই এডিসনেই পাওয়া যেত।·· তোর বইটা আরও আগেকার।"

"আগেকার মানে ব্যাপারটা আগেকার, সেকেণ্ড ওআর্লড ওআরেবও আগেকার। তবে ছাপা হয়েছে পরে। বইটা এদেশে এসেছে ধর পঞ্চাশ-টঞ্চাশে।"

"পরেও আসতে পাবে। অনেক সময় ওল্ড স্টক এজেন্টরাই ক্লিয়ার করে দেয়। এমনিতেও পড়ে থাকে।"

শমীক সিগারেট খেতে খেতে জানলার দিকে তাকাল। বাদলা বাতাস এল যেন এক ঝলক। বৃষ্টি আসছে নাকি?

বসুধা বলল, "তুই যে বইটার কথা বলছিস এরকম বই আরও নিশ্চয় আছে। একটা বইয়ের কথা আমি জানি, 'দি লাস্ট এনিমি'। খুব নামকরা বই ছিল একসময়। পড়েছি। অসাধারণ বই।"

"কার লেখা?"

"রিচার্ড হিলারী। বছর উনিশ বয়েসে রয়েল এয়ার ফোর্সে ঢোকে। বার দুই জখম হয় মারাত্মকভাবে। মুখ পুড়ে গিয়েছিল, গা-হাতও পুড়ে যায়। তাতেও দমে নি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার প্লেন নিয়ে আকাশে ওড়ে। ভাল করে চোখে দেখতে পেত না। ব্রেক করতে পারত না স্বাভাবিকভাবে। তবু তার আকাশে ওঠা থামল না। ওই ভাবেই একদিন বেচারী মারা গেল। কিন্তু হিলারী সেই একটা যুগের বৃটেনের গ্রেট হিরো হয়ে গিয়েছিল। তার জীবনও পার্টলি তোর লোরেনজোর মতন।"

শমীক মন দিয়ে শুনছিল।

বসুধা ধীরেসুস্থে বলল, "ওদের দেশে এরকম আরও আছে, ধর ফরাসী সাঁ একৃসুপেরী। একৃসুপেরীও মারা যায়, তার প্লেন সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। খুব নামী লেখক।"

শমীক বলল, "সবই কি এক ?"

"মানে ?"

"মানে, সকলেই কি একই কারণে মারা গেল ?"

বসুধা জবাব দিল না। ভাবছিল। চুপচাপ বসে থাকল দুজনেই। শেষে মাথা নেড়ে বসুধা বলল, "না, একটা ব্যাপারে মিল থাকলেও অন্য ব্যাপারে নেই। আমি তোকে ঠিক গুছিয়ে বোঝাতে পারব না। তবে হিলারী কিংবা একৃসুপেরী—আর তোর লোরেনজো এক নয়। হিলারীর ব্যাপারটা আমার যতদূর মনে আছে —মরার জন্যেই যেন জেদ ধরে এগিয়ে যাওয়া। অবশ্য এই মরার মধ্য দিয়েই সে যেন কিছু খুঁজে পেতে চেয়েছিল। আর একৃসুপেরী নিজের দেশের জন্যে মারা গেছে। তোর লোরেনজো স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের জন্যে মরে নি।"

শমীক বলল, "লোরেনজো বলেছে: ডেথ ইজ ফাইন্যাল ফ্রিডাম···।"

বসুধা সিগারেটটা নিবিয়ে রেখে দিল। শমীকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "মানে, তোর লোরেনজো জীবনটাকে মিথ্যে মনে করেছে। বইটা তো আমি পড়ি নি, দিস পড়ে দেখব। তবু তুই যা বললি তার থেকে মনে হচ্ছে, লোরেনজো বেঁচে থাকার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় নি। অনেকে মনে করত, হিলারীও নাকি তা পায় নি। হিলারী কেন পায় নি বলা মুশকিল, তবে তোর লোরেনজোর ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। মুসোলিনীর আমলে ফ্যাসিস্টরা দেশটাকে ওইরকমই করে ফেলেছিল, শুধু ধাপ্পা দিয়েছে, পাগলের মতন কাণ্ডকারখানা করেছে, লিবারেল আর সোসালিস্টদের

গলা টিপে দমবন্ধ করে দিয়েছে, বিস্তর খুনখারাপি, টের্রার, অত্যাচার…। ইতিহাস এসবের সাক্ষী।… আমার মনে হয় শমী, লোরেনজোর মতন সেনসেটিভ ছেলেরা তখনকার পলিটিক্যাল ক্লাইমেট, সমাজের অবস্থা, ফ্যাসিস্ট কালচারের মধ্যে জীবনের ভাল কিছু দেখতে পায় নি। বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে অর্থহীন মনে হত, মনে হত অভিশাপ। মুসোলিনী যেভাবে ইথিওপিয়া কেড়ে নিয়েছিল—তার কোনো মানে হয় না।…”

শমীক বলল, “তুই একটা জিনিস ভেবে দেখ বসুধা, সমস্ত য়ুরোপের একটা সময় গিয়েছে—যখন পুরো একটা কি দুটো জেনারেসান একইভাবে নষ্ট হয়েছে। হয় হিটলার, মুসোলিনী, স্ট্যালিন, ফ্রাংকোর দল তাদের নষ্ট করেছে—না-হয় তারা নিজেরাই নিজেদের নষ্ট করেছে এক ধরনের চাপা প্রতিহিংসার বশে। আমি বুঝতে পারি না কেন এরা মরবে? কোন অধিকারে হিটলার মুসোলিনীর দল এদের মারবে? বৃটেনের হাজার হাজার ছেলেই বা কেন মরেছে সেদিন! আমেরিকার ছেলেগুলোই বা কেন আজ তিন যুগ ধরে মরে আসছে? সমস্তটাই আমার কাছে মীনিংলেস।”

বসুধা বলল, “তবু দেশের জন্যে, নিজের লোকেদের জন্যে মরার একটা সান্ত্বনা আছে।”

জোরে জোরে মাথা নাড়ল শমীক। যেন প্রবল আপত্তি জানাল। বলল, “আমি ওটা মানি না। ভৌগোলিক দেশ কোনো আদর্শ হতে পারে না।”

বসুধা অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু দেশ তো ভৌগোলিক।”

শমীক বলল, “না। কাচের বা কাঁসার গ্লাসে আমরা জল খাই বলে গ্লাসটা জল নয়। তেমন দেশের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার কোনো যুক্তি নেই। তুই কোনোদিন প্রমাণ করে বোঝাতে পারবি না যে, একটা মানুষ তার নদী নালা মাটি গাছপালাকে, দেশকে যুক্তিগতভাবে ভালবাসে। ওটা চলতি কথা, তৈরী করা কথা, সংস্কার।”

বসুধা শমীকের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কি বলছিস, শমী? দেশের সঙ্গে মানুষের ভালবাসাটা যন্ত্র দিয়ে মাপার নয়। এখানে যুক্তি হল তার মন, তার অন্তর।"

"স্বীকার করলাম। কিন্তু বল, ভালবাসাটা যদি অন্তর ও আচরণ দিয়ে, অনুভব দিয়েই মাপার হয় তবে দেশের লোকগুলো কোন যুক্তি দিয়ে মরে? কেন তাদের ভেড়ার পালের মতন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়? মুসোলিনী, হিটলার, স্টালিন কি দেশকে ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছে? ভালবাসা মানে কি যুদ্ধ, মৃত্যু, প্রিজন ক্যাম্প আর সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দেওয়া! না সেই ভালবাসাই হবে আমাদের মাপকাঠি? হিটলারের নরমেধ যজ্ঞকে তুই দেশপ্রেম বলিস নাকি?"

বসুধা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুই ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলছিস!"

শমীক বলল, "ব্যাপারটাকে তোরা আগেই গুলিয়ে রেখেছিস। আমি ওটা পরিষ্কার করব।"

বসুধা হেসে বলল, "পারলে কর, আপত্তি কী!"

চার

কয়েকটা দিন শমীক বড় অস্থির হয়ে থাকল। বাইরে থেকে এই অস্থিরতা অতটা বোঝা যেত না, কেননা যা-কিছু ঘটার সবই ভিতরে ভিতরে ঘটছিল। ভেতরে যা ঘটে তা কখনও স্পষ্ট নয় এবং সেটা এমন রহস্যময়ভাবে ঘটে যায় যা মানুষের পক্ষে সব সময় অনুমান করাও সম্ভব নয়। শমীক বুঝতে পারছিল না তার মধ্যে কী ঘটে যাবার উপক্রম চলেছে। কিছুদূর পর্যন্ত সে অবশ্য বুঝতে পারে, বুঝতে পারে যে, কোনো ব্যাপারেই আর সে খুশী হতে পারছে না, কিছুই তার ভাল লাগছে না, পছন্দ হচ্ছে না। শমীক তার রাগ

এবং বিতৃষ্ণাও বুঝতে পারে। যে-দুঃখ তাকে ক্রমশই কেমন এক অন্ধকার কূপের মধ্যে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দিচ্ছে তাও সে অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু তারপর আর কিছু বোঝা যায় না, অন্ধকারে পা বাড়িয়ে থমকে থাকতে হয়।

এই অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত বাইরেও ধরা পড়ল। শমীককে কেউ কখনও গম্ভীর, চুপচাপ, উদাসীন দেখে নি। তার সজীবতা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। বাড়ির লোক লক্ষ করল শমীক কেমন নিস্পৃহ উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। তার দিদি শচীর সেই আঁচিল অপারেসন হল নার্সিং হোমে, তুচ্ছ ব্যাপার, তবু কেন যেন একদিন অকারণ রক্তপাত হয়ে সকলকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। বাড়ির সকলেই যখন চিন্তিত শমীক তখন নির্বিকার। সে দিদিকে দেখতে পর্যন্ত গেল না। এটা তার স্বভাব নয়, দিদি তার বড় আদরের।

দেবপ্রসাদ অবাক হলেন, ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, "তুই তোর দিদিকে দেখতে গেলি না যে।"

শমীক বলল, "সবাই তো যাচ্ছে, ভিড় বাড়িয়ে কী হবে। দিদি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে কাল পরশু ; বাড়িতেই যাব।"

দেবপ্রসাদ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "ভিড় বাড়ানোর কথা নয়, দিদিকে দেখতে যাওয়া তোর কর্তব্য।"

শমীক বলল, "বাড়িতে যাব।"

তার বন্ধুদের মধ্যে কে একজন একদিন শমীককে বলল, "শমী, তোর কি শরীর খারাপ ?"

"না।"

"তোকে কেমন ডিপ্রেসড দেখায় ?"

"দেখাতে পারে।"

"বাঃ, দেখাতে পারে মানে ? একটা কারণ তো থাকবে !"

শমীক কী বলবে বুঝতে না পেরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "জানি না।"

বন্ধুরাও লক্ষ করে দেখল, শমীক তার স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা থেকে সরে যাচ্ছে, তার মুখের সেই সরল সপ্রাণ হাসি ম্লান হয়ে এল। এমনকি শমীকের মধ্যে বরাবরই একটা সহিষ্ণুতা ছিল, তাও আর সব সময় থাকে না। সে সামান্যতেই বিরক্ত হয়, রুক্ষ হয়ে ওঠে।

এইভাবে কিছুদিন কাটল। তারপর স্পষ্ট করেই সকলের নজরে পড়ল, শমীক প্রায়ই রুক্ষ, বিরক্ত, অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। কথাবার্তা কম বলে। নিজেকে এড়িয়ে রাখতে চায়। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে, বইটই পড়ে কখনও, কখনও বিছানায় শুয়ে থাকে। কথাবার্তা যা বলে তাতে তাকে অন্যমনস্কই মনে হয়।

অমৃতর বিয়ের কথা পাকা করতে বাড়ি-সুদ্ধ লোক একদিন ভবানীপুরে গেল, শমীককে অনেক সাধ্যসাধনা করেও নিয়ে যাওয়া গেল না। এতে কোনো ক্ষতি হবার কথা নয়, কিন্তু বাড়িতে সকলেই এই অনুষ্ঠানে শমীককে চেয়েছিল।

করবী বলল, "ছোড়দা, তুই কিন্তু খারাপ করছিস?"

শমীক বলল, "কেন?"

"বারে, এটা বাড়িব কাজ....'

"বাড়ির কাজ বাড়িব লোকই কবছে। আমার যাবার দরকার কী?"

করবী রাগ করে বলল, "তুই কি বাড়িব লোকের বাইরে?"

শমীক কথা এড়িয়ে বলল. "তুই কিছু বুঝিস না। বিয়ের কথাবার্তা ঠিক কবার মধ্যে আমি গিয়ে কী করব? ওসব বুড়োদের কাজ।"

একদিন মৃদুলা বলল. "তোর কী হয়েছে রে?"

"কেন?"

"গুম মেরে থাকিস। সেদিন তো মুখে তালা দিয়ে বসে ছিলি!"

"কথা বলতে আর ভাল লাগে না।"

"এতকাল মুখে তোর খই ফুটত। কথার জোরেই টিঁকে ছিলি।"

"আর টিঁকতে ইচ্ছা করছে না।"

মৃদুলা শমীককে ভাল করে চেনে। একেবারে অকারণ যে কিছু ঘটেছে এটা সে মনে করে না। সেই যে সিনেমা দেখতে এসে টিকিট হারানোর দরুন আর সিনেমা দেখা হল না, ঘুরে বেড়িয়ে মৃদুলাকে ফিরে যেতে হল—তারপব থেকে এর মধ্যে আরও বার দুই দেখা হয়েছে শমীকের সঙ্গে। কোনো বারেই তাকে আর আগের মতন মনে হয় নি। শমীক মন খুলে কথা বলতে চায় না, হাসি নেই, আপন মনে কী ভাবছে তাও বলে না। মৃদুলা শমীককে চেনে, বেশ বুঝতে পারে ছোটখাট কোনো ঘটনা তাকে এমন করে বদলে দিতে পারে না। বড় কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কী ঘটেছে?

মৃদুলা বলল, "শমী, তুই আমায় একটু বল না, কী হয়েছে?"

শমীক নিজের মাথাব চুল ঘাঁটতে থাকে, কিছুই বলে না; মৃদুলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখের পাতা ফেলে না। শেষে কেমন অস্বস্তির সঙ্গে শমীক বলল, "কী বলব বল তো?"

"বাঃ, কী বলবি মানে? তোর নিশ্চয় কিছু হয়েছে।"

শমীক সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "হয়েছে না রে, হচ্ছে। যা হচ্ছে তোকে এখন তা আমি বোঝাতে পারব না। আমিই ভাল করে বুঝতে পারছি না।"

"হেঁয়ালি করিস না, শমী।"

"হেঁয়ালি কেন করব। সত্যি বলছি। তুই তো দেখেছিস—এক-একজনের এমন একটা অসুখ করে—ডাক্তাররা কিছুতেই ধরতে পারে না। এন্তার ওষুধ খাইয়ে যায়—সব রকমের। আমার ব্যাপারটাও অনেকটা সেই বকম।"

"তুই বলছিস, তুই নিজেও জানিস না?"

"না। তবে এক কথায় যদি বলতে হয়, বলব নিজেকে আমি খুঁজছি।"

“কেন ? . তুই কি হারিয়ে গিয়েছিস যে নিজেকে খুঁজবি ?”

“তোর যা ভাবতে ইচ্ছে করে ভেবে নে। তোদের চোখের সামনে আমি জ্যান্ত রয়েছি বলে ভাবছিস বেশ তো নিজের জায়গায় টিঁকে আছি। কিন্তু বেঁচে থাকাই সব নয়, মৃত্থ। বেঁচে থাকলেই যে নিজেকে পাওয়া যায় তাও নয়।”

“আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না। কিন্তু তোকে দেখে সত্যিই আমাব ভাবনা হচ্ছে। তুই এ-রকম ছিলি না···।”

শমীক বলল, “আমি যেমন ছিলাম তেমন থাকব না। যা ছিলাম তার মধ্যে আমার নিজের কতটুকু ছিল আমি জানি না রে।”

মৃত্থলা অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বড় কবে নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, “শমী, তুই যদি এসব পাগলামি নিয়ে থাকিস তা হলে তুই যে কোনদিন একটা কাণ্ড করে বসবি! আমি কিছু বুঝতে পাবছি না। তোর আগেব পাগলামি অনেক ভাল ছিল। এখন তুই পুরো পাগল হবার বাস্তা ধরেছিস।”

শমীক যে পাগলামির পথ ধরেছে এটা এক-এক সময় তাবও মনে হত। আজকাল শমীক নতুন একটা কাণ্ড কবছিল। বোজই রাত্রের দিকে দবজা-জানলা বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে সে একমনে লোবেনজোব কথা ভাববার চেষ্টা কবত। বইটা বাব বাব পড়ে পড়ে এমন হয়েছিল যে, লোরেনজোব সঙ্গে তার অপরিচয় ও দূবত্ব যেন আর ছিল না। শমীক লোরেনজোব সমস্ত জীবনটাই চোখেব সামনে দেখতে পেত, কল্পনা করে নিতে পারত। মনে হত, হৃদয়েব যত কথা সবই যেন লোরেনজো শমীককেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে বলে যাচ্ছে ঃ

“মানুষেব কাছে তার অস্তিত্ব হচ্ছে প্রেমিকের সান্নিধ্যেব মতন, যে সান্নিধ্য হৃদয়কে গভীর থেকে গভীরতর স্পন্দনে স্পন্দিত করে। আমাদের নারীরা ছিল বেশ্যালয়ের ব্যস্ত মেয়েরা—যাদের কাছে

আমরা আবর্জনা হিসেবেই গণ্য হতুম। আমাদের অস্তিত্বকে কোনোদিন অনুভব করা গেল না ; সেটা থেকেও থাকল না ; তার কোনো স্পন্দন আমাদের অনুভবের স্তরে এসে পৌঁছল না।···আকাশ থেকে নামার সময় আমার মনে হত এমন কিছু কেন ঘটে না যাতে বিস্ময়সূচক চিহ্ন হিসেবে আমাদের অবতরণ ঘটে।"

শমীক এ-সব কথার অর্থ প্রথমে ধরতে পারত না, মনে হত কুয়াশার মতন তার বোধের চার পাশে এই কথাগুলো ঝাপসা ভাব গড়ে তুলছে। পরে সে ধীরে ধীরে অনুভব করতে পারছিল লোরেনজো তাদের জীবনের ভয়ংকর ব্যর্থতার কথাই বলতে চেয়েছে। তার ক্রোধ কিংবা উত্তেজনা, তার বিদ্রূপ অথবা তিক্ততা ফুলের সাজানো তোড়ার মতন নয়।

একজনের পক্ষে অন্যজনের হৃদয়ের গভীরতম বেদনা অথবা ব্যর্থতার যথার্থ পরিমাপ সম্ভব নয়, দগ্ধজনের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা যেমন অন্যে বোঝে না—সেই রকম।

তবু একদিন শমীক কোথাও যেন পড়ল, মানুষ তার স্থূল সচেতনতাকে শিক্ষা এবং অনুভবের চেষ্টার দ্বারা কিছুটা তীক্ষ্ণ করতে পারে। যেমন বিলেতের এক প্রকাশক তালাবন্ধ ঘরে চোখ বুজে বিস্তারিত ভাবে কল্পনা করতেন পোল্যাণ্ডে কেমন ভাবে ইহুদী নিধন হয়েছে। তিনি একবার গ্যাসে শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার অভিজ্ঞতা কেমন তাও অনুভব করার চেষ্টা করেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, এই ধরনের মানুষ ঠিক স্বাভাবিক নয়, এর দ্বারা স্নায়বিক অসুস্থতা এসে পড়ে। কিন্তু তাতে কী? স্নায়ুপীড়ার পরিবর্তে চেতনাকে অসাড় করে রাখার চেষ্টা অর্থহীন। ধরে নেওয়া যাক—বিলেতের সেই ভদ্রলোক এমন কিছু করতেন যা নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়া এবং পীড়িত করার মতন এক শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া। সম্ভবত এই প্রক্রিয়াই প্রায়শ্চিত্ত—মানুষ যা প্রায়শই করে থাকে।

ঘর বন্ধ করে, অন্ধকারে, চোখ বুজে শমীক এক কাল্পনিক খেলা শুরু করল। তার মাত্রাও দিনে দিনে বাড়তে লাগল। দশ পনেরো বিশ মিনিট, এমনকি আধ ঘণ্টাও সে চোখ বুজে নিস্তব্ধ হয়ে লোরেনজো ও তার বন্ধুদের ক্রোধ, ঘৃণা, নৈরাশ্য, মৃত্যু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কল্পনা ও অনুভব করতে শুরু করল।

একদিন শমীক এটাও অনুভব করার চেষ্টা করল যে, সে কার্লোর মতন আগুনে ঝলসানো মুখ নিয়ে হাসপাতালে সার্জারির টেবিলে শুয়ে আছে, দগ্ধ চোখের পাতা উপড়ে ফেলার মতন যন্ত্রণা দুই চোখে, নাকের ডগার চামড়া কপালের কাছে ঝুলছে আর মরফিয়ার গন্ধ ভাসছে···। শমীক অনুভব করল, তার সমস্ত অনুভূতি এক প্রবল শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসার অবস্থা হয়েছে।

শমীকের এই দরজা-বন্ধর ব্যাপারটা করবীর কাছে ধরা পড়ে গেল।

করবী বলল, "তুই কী করিস রে ছোড়দা?"

"ধ্যান," শমীক দায়সারা জবাব দিল।

সন্দিগ্ধ হয়ে করবী দাদাকে দেখল, "ধ্যান? তুই ধ্যান করিস?"

বাড়িতে করবীরই কিছুটা জোর-জবরদস্তি ছিল শমীকের ওপর। কারণটা বোধ হয় এই যে, শমীকের শিষ্যা হিসেবে তার কিছু জানার অধিকার জন্মেছিল।

শমীক বলল, "ধ্যান কি শুধু ভগবানের জন্যে তোলা? আমি অন্য ধ্যান করি।"

"কী করিস?"

"যা দেখি নি আর যা দেখেছি এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধানটা যতটা সম্ভব কম করার।"

"তোর হেঁয়ালি বুঝলাম না।"

শমীক চোখ বন্ধ করে ডান হাতের আঙুলগুলো নাকের দু পাশে

রেখে চোখ টিপে থাকল। বলল, "কোনো কিছু দেখা আর তা অনুভব করা এক জিনিস নয়। আমরা চোখে দেখি অনেক, কিন্তু মনে তাদের জায়গা দিই না। শোন, তোকে বলি, একদিন ওয়েলিংটনের মোড়ে এক দৃশ্য দেখেছিলুম। একটা উলঙ্গ ভিখিরি মেয়ে, নেড়া মাথা, ফুটপাথে মরে পড়ে আছে, তাব মাথা হাইড্রেণ্টের ওপর, গলগল করে কাদাটে গঙ্গাজল বেরিয়ে তার নেংটো শরীরেব পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কারও কোনো দৃকপাত নেই। ট্রাম চলেছে, বাস চলেছে, ট্রাফিক পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, সাঙ্গুভেলিতে বাবুরা চা খাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে আমার সারা গা শিউরে উঠেছিল। কলকাতা কর্পোরেশন আব পুলিস আব গভর্নমেণ্টের ওপর রাগ হয়েছিল। কিন্তু সেই দৃশ্যটা সেদিন বাত্রের পর আর আমার তেমন একটা মনে থাকে নি।"

করবী গা-শিউরোনো ভাব কবল। বলল, "কলকাতার রাস্তাঘাটে আর হাঁটা যায় না।"

শমীক বলল, "সেটা অন্য কথা। যা বলতে যাচ্ছিলাম শোন। ওই দৃশ্যটা তুই যদি ভুলে যেতে চাস, দু দিন পাঁচ দিন—বড় জোব দশ দিনের মধ্যে ভুলে যাবি। কিন্তু যদি ভুলতে না চাস, যদি বোজ তুই শোবার আগে অন্ধকাবে একা শুয়ে শুয়ে ভাবিস অমনি করে তুই ফুটপাথে গঙ্গাজলেব পাশে পড়ে আছিস রাস্তার কুকুব ছাড়া কেউ পাশ দিয়ে যাচ্ছে না– তা হলে তোর কেমন লাগবে?"

করবী শিউরে উঠে বলল "বলিস না, বলিস না. শুনলেই কেমন করে ওঠে…।"

শমীক বলল, "কেমন-করে-ওঠাটা কিছু নয়, ওই ভিখিরি মেয়েটার অবস্থায় নিজেকে রাখবাব চেষ্টা করাটাই বড় কথা। যদি চেষ্টা করিস—সেটা অনুভবের কাছাকাছি যাবে। নিছক দেখা আব সেই দেখাকে যতটা সম্ভব নিজের করে ভাবার মধ্যে অনুভব করাব চেষ্টা আছে। নিজেকে জড়িয়ে ফেলা আছে। আমি বলছি না—

এতে যথার্থ দুঃখটা অনুভব করা যায় ; আমি বলছি—এ-রকম করতে পারলে নিছক দেখা আর নিজেকে সেই ঘটনার অংশ করে তোলার মধ্যে যে ব্যবধান সেটা কমে আসে।"

শমীকের মাথায় যে প্রচণ্ড একটা পাগলামি ভর করেছে করবীর তাতে আর সন্দেহ হল না। বলল, "এ-সব করলে তুই নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবি।"

"না-হয় হলাম!"

"হলাম কি রে ছোড়দা? এ কি কেউ করে? এই করতে করতে শেষে অসুখ-বিসুখ বাধাবি নাকি? একটা সর্বনাশ করবি?"

"কেউ করে না বলিস না। কেউ কেউ করেছে।"

"যে করে করুক, তুই কেন করবি?"

"যারা করে না তারা না করুক, আমি কেন কবব না?"

এমন অদ্ভুত জবাবে থতমত খেয়ে কববী বলল, "করলে তুই মরবি। তোর মাথাব গোলমাল হয়ে যাবে।"

শমীক হেসে বলল, "মাথার গোলমাল একটু-আধটু হওয়া ভাল রে রুবি। তুই ভাবিস না।"

শমীক যাকে 'ধ্যান' বলেছিল, তার সেই ধ্যান ভঙ্গ হবাব কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরং এই হল যে সে আর শুধু লোরেনজোকে নিয়ে পড়ে থাকল না, তার মাথায় আরও নানা বকম ভাবনা আসতে লাগল। খবরেব কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে যাবতীয় দুঃখের ও দৈন্যের, নৈরাশ্যের ও ব্যর্থতার খবরগুলো খুঁজে বেব করতে লাগল। কোথায় রেল লাইনের ঝোপের পাশে গলিত-দেহ একটা ছেলেকে পাওয়া গেছে, কোথায় একটা গুণ্ডার দল তাড়া কবে এক বয়স্ক ভদ্রলোককে বাড়ির মধ্যে ঢুকে খুন কবেছে, হাসপাতালে কাকে ভরতি করে নি, ওষুধ পর্যন্ত দেয় নি, বাড়িতে ফেবত পাঠিয়ে দিয়েছে, পরের দিন সকালে মার কোলে মাথা বেখে সে মারা গেল, কোথায়

দুটো নকশাল ছেলেকে পুলিস সরাসরি গুলি করে মেরেছে, ওই সব খবর শমীক সংগ্রহ করে রাখত, এবং রাত্রে তার ধ্যানের মধ্যে বিস্তারিত করে তাদেব দেখবাব ও অনুভব করবার চেষ্টা করত। জেলের মধ্যে গণ্ডগোল আর পিটিয়ে ছেলে মারার কথাও সে যেমন সংগ্রহ করত আব ভাবত—সেই রকম স্ত্রীর সামনে স্বামীকে ছোরা মারার বিবরণও সে রেখে দিত। রেখে দিত, কেননা এই তো সমাজের চেহারা! দুঃখ বলো, বিস্ময় বলো, ঘৃণা বলো, নিষ্ঠুরতা বলো—সবই তো এর মধ্যে।

শুধু কাগজ নয়, রাস্তাঘাটে বেরুলেই শমীক চোখ খুলে দেখবার চেষ্টা করত, আশেপাশে কী ঘটছে! পচা ফলের মতন রাস্তায় ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা ভিখিরি; ঘেয়ো কুকুরের মতন অজস্র বাচ্চা-কাচ্চা; মরা বেড়ালের মতন একটা মাংসের ডেলা কোলে করে বসে এক মায়ের ডাকছাড়া কান্না, বাসের চাকায় থেঁতলে যাওয়া মাথার খুলি—এ-সবই কলকাতায় এত অজস্রভাবে ছড়িয়ে আছে যে কিছু-না-কিছু তার চোখে পড়ত।

বসুধা একদিন বলল, "শমী, তোর অবসেসান্ গ্রো করছে।"

শমীক বলল, "তাতে কী হবে?"

"শরীর তোব এখনই বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে, আরও খারাপ হবে, মেণ্টাল পেশেণ্ট হয়ে পড়বি।"

শমীক বলল, "তুই কি মনে করিস আমরা খুব সুস্থ রয়েছি? চারিদিকের চেহারা কি সুস্থতার?"

বসুধা আপত্তি করল না, বলল, "আমি তোর কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু জীবনটাকে অসুস্থ করে লাভ কী?"

"তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে—তুই আমায় এড়িয়ে থাকার পরামর্শ দিচ্ছিস।"

"মানে?"

"মানে তুই বলছিস, অসুস্থতার মধ্যে সুস্থ থাকার ভান করতে।"

"না," মাথা নাড়ল বসুধা, "আমি তোকে ভান করতে বলছি না। তুই ভান করার ছেলে নয়। আমি তোকে বলছি—এত ভাবনা ভেবে তোর কী হবে, শমী। যে অবস্থার কথা তুই বলছিস —সেই অবস্থা কে না চোখে দেখছে। তোর-আমার মতন ছেলেরা অন্তত দেখছে। কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আমাদের আর কী করার আছে।"

শমীক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর বলল, "কী করার আছে তা আমি এখনও ভেবে দেখি নি। এখন শুধু দেখছি, দেখছি। দেখে যাচ্ছি আমরা কতটা অসুস্থ, অস্বাভাবিক।"

বসুধা বলল, "তা বলে তুই বেছে বেছে যা মন্দ তাই দেখবি?"

শমীক ঠাট্টা করে বলল, "মন্দগুলো বাদ দিতে বলছিস?"

বসুধা মাথা নেড়ে বলল, "শুধু মন্দে কোনো জ্ঞান আসে না।"

"আমি জ্ঞানী হতে চাই না।"

"কী হতে চাস তা হলে?"

শমীক কী হতে চায়?

সামান্য চুপ করে থেকে সে বলল, "জানি না। আমি বোধ হয় কিছুই হতে চাই না। শুধু জানতে চাই আমি কোথায় আছি।"

শমীকের শরীর স্বাস্থ্যের ক্ষয়টা বাড়ির লোকের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। ও কোনো কালেই হৃষ্টপুষ্ট নয়; স্বাস্থ্য লোহার মতন কঠিন নয়, জীবনীশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাই তার শরীর-স্বাস্থ্যের সব। শমীকের সেই ছোটখাট, ছিপছিপে চেহারা রোগা হয়ে গেল, তার মুখের হাড় আরও স্পষ্ট হয়ে খটখট করতে লাগল, চোখ ডুবে আসা তারার মতন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। আজকাল আবার শমীক মাঝে মাঝেই দাড়িটাড়ি কামানোর ঝঞ্ঝাটে যেতে চাইত না। ফলে তাকে আরও অসুস্থ দেখাত।

আশালতা ছেলের এই ব্যাপারটা অনেক দিন ধরেই পছন্দ করছিলেন না। শমীককে কতবার কত রকম ভাবে বলেছেন। বুঝিয়েছেন। করবীকে ডেকে ডেকে বার বার জিজ্ঞেস করেছেন, কী হয়েছে রে তোর দাদার? করবী কিছু বলতে পারে নি। শমীকের ধ্যানের কথাও বলা উচিত হবে কি না বোঝে নি, ভেবেছে —দাদাকে নিয়ে হইচই বাধিয়ে লাভ নেই।

আশালতা স্বামীকে বললেন, "তুমি ওকে দাদার কাছে নিয়ে যাও।"

দেবপ্রসাদ বললেন, "বলেছিলাম। তোমার ছেলে বলল শরীরে কিছু হয় নি।"

"তা হলে হয়েছে কোথায়, মাথায়?"

"ওটা তো তোমরা পাঁচজন মিলে বরাবরই বিগড়ে রেখেছ।"

"আমরা মানে? তুমিই কি ওকে কম আসকারা দিয়েছ!"

দেবপ্রসাদ চশমা খুলে রাখতে রাখতে বললেন, "তোমার কোলের ছেলে—সাত পুরুষের মুখে জল দেবে, ওকে আমার বলার কী আছে। আমি বরাবরই তোমার শমীকে সমীহ করে এসেছি।"

আশালতা রাগ করে বলেন, "ছেলে চেয়েছিলুম আমার বাপের বাড়ির গুষ্টির মুখে জল দেবার জন্যে নয়। জল তোমাদের সাত পুরুষ পাবে—আমার কেউ নয়।"

দেবপ্রসাদ অকারণ তর্কের মধ্যে গেলেন না। বললেন, "চারুকে বলো, চারু পারবে। তোমার ছেলে আমায় তেমন গ্রাহ্য করে না।"

আশালতা আর ইন্দুলেখা চারুপ্রসাদকে ধরলেন।

চারুপ্রসাদ কিছুদিন ধরে দুটো বড় মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। একটা মামলায় তাঁর মক্কেলের ভরাডুবির আশঙ্কা। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। তার ওপর অমৃতর বিয়ে। মেয়েপক্ষ অগ্রহায়ণ মাসে অসুবিধে বলে মাঘ পর্যন্ত বিয়েটা পিছিয়ে

রেখেছে। বিয়ের ব্যাপারটা চারুপ্রসাদ দাদার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, তবু তাঁকে সব রকমই জানতে শুনতে হয়।

চারুপ্রসাদ এই বাড়িতে একমাত্র ব্যক্তি যিনি শমীকের জন্যে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা করেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দু-চারটে বছর হয়ত শমীক এই রকম পাগলামি করে বেড়াবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একেবারে অন্য পাঁচজনের মতন হয়ে যাবে। একদিন ঠিক এসে বলবে: কাকা, চলো কাল তোমার সঙ্গে কোর্টে বেড়িয়ে আসি। চারুপ্রসাদ সেদিনের জন্যে অপেক্ষা করছেন মনে মনে। শমীককে তৈরী করতে তাঁর দু-চার বছর লাগবে—তা লাগুক—তারপর ওই ছেলে কোর্টে দাঁড়িয়ে জজসাহেবদের চমকে দেবে। নিজের ওকালতি জীবনে চারুপ্রসাদ যেমন সাফল্য অর্জন করেছেন তেমন তাঁর ব্যর্থতাও রয়েছে। বিস্তর পরিশ্রম এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে যাওয়াই ছিল তাঁর মূলধন। ক্ষুরধার বুদ্ধি আর কথা বলার কায়দাটা রপ্ত করতে পারেন নি, ফলে ওকালতির এই দিকটায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। লোকে বলে: চারুবাবু আইনটা জানেন, কিন্তু আর্গুমেণ্ট করতে পারেন না; জানেন সব--অথচ ভদ্রলোক বলার সময় একেবারে ডালভাত হয়ে যান। চারুপ্রসাদের ধারণা, শমীককে যখন তৈরী করে তিনি আদালতে হাজির করবেন—তখন দেখে নেবেন, কথা বলার দৌড়ে কে কতটা পাল্লা দেয়! শমীক যে ভীষণ একটা বলিয়ে-কইয়ে হবে এতে চারুপ্রসাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আশালতা একদিন অনুযোগ করে বললেন, "ঠাকুরপো, তুমিও তা হলে চোখ বন্ধ করে থাক।"

চারুপ্রসাদ বললেন, "আমি চোখ খুলেই রেখেছি।"

ইন্দুলেখা বললেন, "খুলে রেখেছো তো কিছু করছ না কেন?"

চারুপ্রসাদ আশালতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী করতে হবে বলো? রাগারাগি করব? বকব?···তোমরা একটা কথা বুঝতে পারছ না বউদি, শমীর যা বয়েস হয়েছে তাতে একটা-কিছু

করা তার উচিত ছিল, কিন্তু সেই ফাইন্যাল ল' পাস করেছে কবে? বছর খানেক। এই একটা বছর শমী চুপচাপ বসে আছে। এমনিতেই কত ছেলে বি এ এম এ এঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারী পাস করে চাকরির অভাবে বসে থাকে। শমীর কপালটা সেদিক থেকে ভাল, ভগবান তার খাওয়া-পরার অভাব রাখেন নি, কাজেই শমীবাবু একটু গড়িমসি করে দিন কাটাচ্ছেন। দাও না কাটাতে, কী হয়েছে? আমরাও তো প্রায় এই রকম বয়েসে কাজেকর্মে ঢুকেছিলাম।"

আশালতা বললেন, "বেশ, কাজকর্মের কথা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু ওর ভাব-সাব তোমার চোখে পড়ছে না? শরীরটার কেমন হাল করেছে দেখছ না?"

চারুপ্রসাদ একবার স্ত্রীকে দেখে নিলেন; তারপর বউদির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তো তোমার জাকে সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করি।"

ইন্দুলেখা বললেন, "আমায় জিজ্ঞেস করেই তোমার কাজ ফুরিয়ে গেল? তুমি নিজে জানতে পার না?…আমাদের ও কিছু বলে নাকি! তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়।"

আশালতা বললেন, "আমাদের তো কিছু বলে না, ঠাকুরপো।"

চারুপ্রসাদ বললেন, "আমাকেও তো এড়িয়ে যায় আজকাল। আচ্ছা, দেখি…।"

"আগে ওর শরীরটা দেখানো দরকার," ইন্দুলেখা মনে করিয়ে দিলেন।

চারুপ্রসাদ শুনলেন। কিছু বললেন না।

অমৃত, যে সকাল বেলাতেই কন্‌ভেন্ট রোডের কারখানায় ছোটে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে, বাড়ি ফিরেও হিসেবের কাগজপত্র, কোটেসান আর যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেসান নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে, তার পক্ষে বাড়ির খবরাখবর খুঁটিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অমৃত

তার দুই পাসকরা বন্ধুকে নিয়ে কনভেন্ট রোডে কারখানা খুলেছে বছর দুয়েক হতে চলল। তিন তরুণ এঞ্জিনিয়ার মিলে আজকের দিনে দাঁড়াবার যে চেষ্টা করছে সেটা সহজসাধ্য নয়। পরিশ্রম তাদের কিছু দিয়েছে, অমৃত আর তার বন্ধুরা এখন মোটামুটি পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে।

এই অমৃতও একদিন ভাইকে বলল, "শমী, তুই কেয়ারফুল হ; বড় একটা অসুখে পড়ে যাবি।"

শমীক বলল, "না, পড়ব না।"

"তোর চেহারা তো না-পড়ার কথা বলছে না। গোলমালটা কোথায়? হয়েছে কী তোর? কারও কথা শুনছিস না শুনলাম। বাড়িতে তুই একটা প্রবলেম হয়ে উঠলি।"

শমীক বলল, "আমায় নিয়ে তোমরা প্রবলেম তৈরী কবছ।"

অমৃত মারপ্যাঁচের কথা জানে না, বলল, "হাঁস আগে না ডিম আগে—এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। প্রবলেম ইজ্ প্রবলেম। তুই নিজেই ভেবে দেখ, এটা উচিত কি উচিত নয়। এই বাড়ি নিয়েই তোকে থাকতে হবে। অযথা সকলকে ভাবিয়ে তোর লাভ কী।"

শমীক বলল, "আমায় নিয়ে তোমরা ভেবো না।"

অমৃত অখুশী হয়ে বলল, "কথা ছাড়া জীবনে আর কিছু শিখলি না।"

বাড়িতে যখন সকলেই শমীককে নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়েছে তখন একদিন সে তার 'ধ্যানে'র পর মাথা ঘুরে পড়ে গেল। অতবড় বাড়িতে তার পড়ে যাবার শব্দ কেউ শুনতে পেল না, জানতেও পারল না।

মাথায় লেগেছিল শমীকের। কয়েক মুহূর্ত কেমন হুঁশ ছিল না। যখন হুঁশ ফিরে পেয়ে উঠে বসল, তখন সে হঠাৎ যেন কী পেয়ে গেল।

পাঁচ

মক্কেলদের বিদায় দিয়ে চারুপ্রসাদ উঠব-উঠব করছেন, তাঁর টাইপিস্ট কানাইবাবুও চলে গেলেন সামান্য আগে, এমন সময় শমীক সামনে এসে দাঁড়াল।

চারুপ্রসাদ কেমন একটু অবাক হয়ে ভাইপোকে দেখলেন। তাঁর অবাক হবার কারণ, শমীক অনেকদিন আর এভাবে নীচে কাকার মক্কেল-ঘরে আসে নি, আগে মাঝে মাঝে আসত। দ্বিতীয় কারণ, ক'দিন আগে চারুপ্রসাদ ভাইপোকে খানিকটা শাসনটাসন করার চেষ্টা করেছিলেন।

শমীককে যেন কৌতূহলের চোখেই চারুপ্রসাদ লক্ষ করলেন।

শমীক কাকার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, "তোমার ঘর এর মধ্যেই খালি হয়ে গেল কেন?"

চারুপ্রসাদ গায়ের শাল গুছোতে গুছোতে বললেন. "শরীরটা ভাল লাগছে না। শীতের এই সময়টায় বাত একবার করে চাগাড় দেয়!" বলে আয়াস করে বসলেন। "তুই ললিতদার কাছে গিয়েছিলি শুনলাম।"

শমীক চারুপ্রসাদের মুখোমুখি বসল। বলল, "কাল গিয়েছিলাম।"

"কী বলল?"

"বলল রাঁচি যেতে।"

চারুপ্রসাদ প্রথমটায় থমকে গেলেন। শমীক তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছে? ক'দিন আগে ভাইপোকে যে তিনি বকাবকি করেছিলেন তার কারণ শমীকের স্বাস্থ্য। ললিতদা, মানে শমীকেরই মামা ললিত-মোহন এখন রীতিমত বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। বার-দুই হার্ট অ্যাটাকের পর কোথাও আর আসা-যাওয়া করেন না, বেহালার দিকে বাড়ি

করেছেন ছোটখাট, সেখানেই থাকেন। ললিতদার ছেলে দিল্লিতে, মেয়ে বিয়ের পর হায়দ্রাবাদে, জামাই ডাক্তার। ললিতদার স্ত্রী মারা গিয়েছেন মেয়ের বিয়ের আগেই ; দূরসম্পর্কের এক বিধবা বোন ললিতদাব দেখাশোনা করেন।

এ-বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বেশীর ভাগটাই টেলিফোনে। দেবপ্রসাদ আর চারুপ্রসাদ খোঁজখবর করতে ভোলেন না, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না নিয়মিত। সেটা সম্ভব নয়। আশালতা দাদাকে দেখে আসেন দু-এক মাস অন্তর। দেবপ্রসাদও এক-আধবার যান।

চারুপ্রসাদ ভাইপোব কথা বুঝতে না পেরে বললেন, "তুই তা হলে যাস নি?"

শমীক মাথা হেলিয়ে বলল, "বললাম তো গিয়েছিলাম।"

"কী বলল ললিতদা?"

"বলল, রাঁচি যা।"

চারুপ্রসাদ রাগ করে বললেন, "তুই তামাশা করছিস?"

শমীক এবার হেসে মাথা নাড়ল।

চারুপ্রসাদ হাসিটা লক্ষ করলেন। আজকাল তিনি শমীককে হাসতে বড় একটা দেখেন না। কেন যেন একটু খুশীই হলেন তিনি। বললেন, "কী বললেন ললিতদা ঠিক করে বল।"

শমীক একটু চুপ করে থাকল। কাকার মস্ত বড় টেবিলের চারিদিকে স্তূপীকৃত কাগজপত্র আর নথির বাণ্ডিল। কলম পেনসিল কালি। আলপিন আর ক্লিপ। ছাইদানটা গলায় গলায় ভরে আছে। পেতলের ডাঁটিঅলা কাচেব শেড্ পরানো পুরানো অথচ দামী টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছিল। শমীকের পিঠের দিকে মক্কেলদের বসবার জায়গায় পাঁচ-সাতটা চেয়ারের মাথার ওপর আরও একটা বাতি জ্বলছে, আলো তেমন জোর নয়।

শমীক বলল, "মামা বলল, তোর শরীরে তেমন কিছু হয় নি, মাথায় হয়েছে। রাঁচি যা।"

চারুপ্রসাদ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোকে দেখেছেন না এমনি বললেন?" এ-রকম সন্দেহ করার কারণ ছিল চারুপ্রসাদের। ললিতমোহন আজকাল আর ডাক্তারী করেন না। নেহাত আত্মীয়স্বজন কেউ ধরে বসলে দেখেন।

শমীক বলল, "দেখেছে।"

"তোর কিছুই হয় নি বললেন?"

"কিছুই হয় নি ; শরীরে তেমন কিছু নয়, সামান্য দুর্বলতা···"

"মাথায় কী হয়েছে?"

"রোগ," শমীক একটু হেসে বলল, "ঘুমোবার ওষুধ খেতে দিয়েছে।"

চারুপ্রসাদ যেন আঁতকে উঠলেন। "তুই ঘুমোবার ওষুধ খাবি? তোর বাবা এখন পর্যন্ত ওষুধ না খেয়ে ঘুমোতে পারে, আমি কখনো ঘুমোনোর ওষুধ খেলুম না, তুই একটা জোয়ান ছেলে—তোকে ঘুমোবার ওষুধ খেতে হবে?"

শমীক বলল "তোমরা পুরোনো লোক, তোমাদের ঘুম এমনিতেই হয়। আমাদের হয় না।" বলে শমীক কেমন দুষ্টুমি করে হাসল।

চারুপ্রসাদ খেয়াল করলেন না। ঘুমের ওষুধটষুধ তিনি পছন্দ করেন না। আজকাল যেভাবে হুটোপাটি করে চিকিৎসা করা হয় তাও তাঁর মনঃপূত নয়। কিন্তু ললিতমোহন যদি বলে থাকেন ঘুমের ওষুধ খেতে চারুপ্রসাদ না বলতেও পারবেন না।

শমীক কাকার মাথার ওপর দিয়ে ঈশ্বরদাসের বিশাল ছবিটার দিকে তাকাল, টেবিলের আলো উত্তর দিকের ঝোলানো ছবির দিকে সরাসরি যাচ্ছে না। ধূসর বিবর্ণ ছবিটা প্রায় ময়লা অয়েল ক্লথের মতন দেওয়াল জুড়ে ঝুলে রয়েছে।

চারুপ্রসাদ বাতের জন্যে একটা তামার পাত বাঁ হাতে পরেন। ঘুমের ওষুধের কথায় তিনি যেন সচেতন হয়ে বাঁ হাতের পাতটা ডান

হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। বললেন, "ললিতদার সঙ্গে আমি কথা বলব।"

"আবার বলবে ?"

"তুই আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস। রাঁচি, মাথার রোগ, ঘুমের ওষুধ—কী সব বলছিস—। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

শমীক হেসে বলল, "তুমি আর কেন কথা বলবে। তোমার দাদা কথা বলে নিয়েছে।"

চারুপ্রসাদ যেন চোখ কুঁচকে ভাইপোকে দেখলেন। দাদা কথা বলেছে জেনে নিশ্চিন্ত বোধ করলেও শমীকের তামাশা করাব ভঙ্গিটা তাঁর মন্দ লাগল না। এ বরং ভাল। শমীকের কথাবার্তার এটাই ধরন। এই ঢঙে কথা বললে তবু তাকে স্বাভাবিক অনুভব করা যায়।

চারুপ্রসাদ বললেন, "কয়েকটা দিন বেড়িয়ে আয় না।"

"কোথায় ?"

"যাবার জায়গার অভাব আছে নাকি! এখন শীতের সময়। সামনে বড়দিন। কোথাও চলে যা—বিশ-পঁচিশ দিন থাক, খাবি দাবি ঘুরে বেড়াবি—শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।" বলতে বলতে চারুপ্রসাদ টেবিলের ওপর থেকে সিগাবেটের প্যাকেট তুলে নিলেন।

শমীক নিজের মাথার রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকল। মাঝে মাঝে ঈশ্বরদাসের ছবির দিকে তাকাচ্ছে, আবার চোখ নামিয়ে কাকাকে লক্ষ করছে।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চারুপ্রসাদ বললেন, "আমার মক্কেলের বাড়ি রয়েছে দেওঘরে। যাবি ?"

মাথা নাড়ল শমীক, যাবে না।

"কোথায় যাবি তাহলে ? ঘাটশিলা।"

"কোথাও যাব না।"

চারুপ্রসাদ অখুশী হয়ে বললেন, "কলকাতায় বসে শরীর সারবে না।"

শমীক বলল, "শরীর সারাতে চাইছি না।"

"গাধার মতন কথা বলিস না," সামান্য ধমকের গলায় চারুপ্রসাদ বললেন, শরীর সারাবি না তো পরে কি বিছানায় শুয়ে থাকবি।"

শমীক মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসল, যেন কাকাকে আরও রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

চারুপ্রসাদ গম্ভীর হবার ভান করে সিগারেট খেতে লাগলেন।

একটু পরে শমীক বলল, "কাকা, আমার একটা কথা আছে।"

চারুপ্রসাদ কোনো জবাব দিলেন না।

শমীক কাকার ছেলেমানুষিতে মনে মনে হাসল। "তুমি একটা ভাল কেস নেবে?"

চারুপ্রসাদ ভাইপোর মুখ দেখতে লাগলেন। শমীক কি তামাশা করবার চেষ্টা করছে?

টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ে শমীক বলল, "এই কেসটা ইণ্টারেস্টিং। তুমি নাও।"

"কার কেস?"

"সে পরে বলব। তোমার ফী দিতে পারব না।"

"ব্যাপারটা কী শুনি?"

"বাঃ, তুমি আগে অ্যাক্সেপ্ট করো তবে না বলব।"

"না শুনে আমি কোনো কেস নিই না।"

"বেশ, ধরো আমি এই কেসটা নিচ্ছি। আমার হাতেখড়ি হচ্ছে এই কেসটা নিয়ে। তুমি আমার সিনিয়ার হও।"

চারুপ্রসাদ যেন সামান্য কৌতূহল বোধ করলেন। শমী কেস হাতে নিচ্ছে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, আবার কৌতূহলও দমন করা যায় না। অবশ্য মুখে বললেই শমী কেস হাতে নিতে পারে না। আদালতে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। লাইসেন্স চাই। সিনিয়ারের কাছে কাজ শিখতে হবে। এসবের জন্যে

চারুপ্রসাদই রয়েছেন। যাক গে, এসব পরের কথা, শমীক যদি চায় সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চারুপ্রসাদ বললেন, "পেটে কথা রেখে কাজ হয় না।"

শমীক হেসে বলল, "মামলাটা কঠিন। তুমি যদি আমার সিনিয়ার হও খুব ভাল, যদি না হও তা হলে..."

চারুপ্রসাদ বললেন, "মামলাটা কিসের তাই শুনি—"

শমীক কাকাব মাথার ওপর দিয়ে ঈশ্বরদাসেব ছবির দিকে তাকিয়ে থাকল। মুহূর্তের জন্য তার চোখ ঝকঝক করে উঠে আবার শান্ত হয়ে এল, বলল, "এখন নয়, পরে শুনবে।...চলো, রাত হয়ে গেছে, খেতে যাই।"

চারুপ্রসাদ আবার বোবাব মতন চোখ করে তাকালেন। শমীকের মাথাটাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? আশ্চর্য।

আজ রাত বেশী না হওয়ায় খাবার টেবিলে দেবপ্রসাদ ছিলেন। দেবপ্রসাদ, অমৃত আর করবী। আশালতা অন্য পাশে বসে খাবার তদারকি করছিলেন। পাথরের বড় টেবিলের চার পাশে গোটা আষ্টেক চেয়াব। দরকার করে না, তবু আছে। বাড়িতে লোকজন তো প্রায়ই আসে। গৌরী আসেন কখনো-সখনো ছেলেমেয়ে নিয়ে, শচী আসে, পূরবী কমই আসে, জামাইরা আসা-যাওয়া করে। মেয়েদের ছেলেমেয়েরাও রয়েছে।

খাবার টেবিলের চলনটা এ বাড়িতে আগে ছিল না। দেবপ্রসাদের আমলে হয়েছে, তাও পরে। আশালতা এবং ইন্দুলেখা এঁটোকাঁটার বাতিকের জন্যে কাঠের টেবিল ঢুকতে দেন নি। ফলে কাঠের পায়ার ওপর সাদা পাথরের টেবিল। দেখতে ভালই লাগে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় সব সময়।

রাত্রের দিকের খাওয়াটা আগে একসঙ্গেই সব হত। গিন্নারা শুধু বসতেন না। আজকাল চারুপ্রসাদের প্রায়ই রাত হয়, মক্কেল

নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দেবপ্রসাদের বয়েস হচ্ছে, তিনি নিয়মের মানুষ, বেশী রাত্রে খেলে হজমের অসুবিধে বোধ করেন বলে সাধারণত সাড়ে ন'টা নাগাদ খেয়ে নেন। করবী আর অমৃত তাঁর সঙ্গে বসে। শমীক আগে বসত। এখন আর বসে না। সে আজকাল বেশীর ভাগ দিনই একা একা খেয়ে উঠে যায়, মা আর কাকিমা কেউ-না-কেউ থাকে।

চারুপ্রসাদ আর শমীককে খাবার ঘরে আসতে দেখে দেবপ্রসাদ যেন বিস্ময় বোধ করলেন। এ-রকম তো হয় না আজকাল।

আশালতাও অবাক হয়েছিলেন। মাথার কাপড় বাঁ হাতে ঠিক করে নিতে নিতে দুজনকেই লক্ষ করলেন।

চারুপ্রসাদ বসলেন। শমীক তাঁর পাশে বসল। পাশাপাশি উলটো দিকে দেবপ্রসাদ আর করবী। অমৃত প্রায় আশালতার কাছাকাছি বসে। আশালতা টেবিলের মাথার দিকে চেয়ার সামান্য সরিয়ে বসে আছেন।

করবী চোখ তুলে শমীককে দেখে চোরা হাসি হাসল। অমৃতও লক্ষ করল ব্যাপারটা।

চারুপ্রসাদ চেয়ারে বসে এমন একটা ভাব করে চারদিকে তাকালেন, মনে হল, যেন ঘর-পালানো ছেলেকে জব্দ করে ধরে এনেছেন; আশালতার চোখে চোখ রেখে চাপা হাসি হাসলেন।

"কই বউদি, দাও; খেতেটেতে দিতে বলো," চারুপ্রসাদ বললেন।

দেবপ্রসাদ ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ। চাকরি-জীবনের শেষের দিকে একবার বুকে ব্যথা উঠেছিল। তীব্র। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার-বদ্যি এসে বুকটাকে তন্নতন্ন করে দেখেছিল। হৃদ্‌পিণ্ডের কোনো গোলযোগ ধরা না পড়লেও সকলেই কিছু কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। যেমন, চর্বি জাতীয় খাদ্য কম খেতে, রক্তের চাপের দিকে লক্ষ রাখতে, আর উদ্বেগ অশান্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে। দেবপ্রসাদ

খানিকটা গোলগাল ধরনের মানুষ, দেখতে নিশ্চয় সুন্দর ছিলেন এককালে, প্রবীণ বয়েসে পাকা চুল মাথায় নিয়ে সৌম্যদর্শন হয়ে বসে আছেন।

দেবপ্রসাদের খাওয়া শেষ হয়ে আসছিল। তিনি আস্তে আস্তে খান, পরিষ্কার করে বেছেবুছে।

করবীর খাওয়া শেষ হয়েছে। সে বসে ছিল।

অমৃত দেবি করে এসে বসেছিল, তাব খাওয়া শেষ হযে এল।

আশালতা কাউকে ডাকার জন্যে দরজাব দিকে মুখ ফেবাবার আগেই করবী চেঁচয়ে চেঁচিয়ে ঠাকুবকে ডাকল।

চারুপ্রসাদ আশালতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ললিতদাব কাছে তো গিয়েছিল শমী।'

আশালতা সামান্য মাথা নাড়লেন। বোঝালেন যে, তিনি শুনেছেন।

দেবপ্রসাদের দিকে চোখ ফেবালেন চারুপ্রসাদ। "তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, শুনলুম।"

"কী বলল ললিতদা?"

"বড় বোগটোগ এখনও কিছু হয় নি বলল, তবে শবীরে বেশ দুর্বলতা, হজমেব গোলমাল হচ্ছে," বলতে বলতে দেবপ্রসাদ থেমে গেলেন, যেন বাকিটা কোনো কাবণে বলতে চাইলেন না।

চারুপ্রসাদ বললেন, "ওকে নাকি ঘুমের ওষুধ খেতে দিয়েছে?"

"প্রেসক্রিপসান্ ওর কাছে।"

আশালতা ছেলেকে বললেন, "তুই ওষুধগুলো আনিস নি?"

"না," শমীক বলল।

দেবপ্রসাদ মুখ নীচু করে খাচ্ছিলেন, চোখ তুললেন না।

করবী বলল, "অনেক ওষুধ, চার-পাঁচটা।"

আশালতা আবার ছেলেকে বললেন, "আনিস নি কেন? কাল থেকে আজ পর্যন্ত ওষুধ আনার সময় হল না?"

শমীক বলল, "ইচ্ছে হল না।"

শমীক এমন ভাবে কথাটা বলল যে দেবপ্রসাদও চোখ না তুলে পারলেন না।

ঠাকুর খাবার নিয়ে ঘরে এল। পাশে ইন্দুলেখা। মাথায় কাপড়। ঠাকুরের হাত থেকে খাবারের থালা নিয়ে প্রথমে শমীকের সামনে রাখলেন। পরে স্বামীর। এ বাড়ির এটাই নিয়ম, ছেলেমেয়েরা পাশে থাকলে আগে তাদের খাবার দিয়ে পরে বড়দের দিতে হয়। বিশেষ করে নিজের স্বামী বা ছেলেমেয়ের দিকে পরে দৃষ্টি দেওয়াই সৌজন্য।

টেবিলের মাঝখানে কাচের ধবধবে জারে জল ঢাকা ছিল; উপুড় করা গ্লাস। ইন্দুলেখা জলও গড়িয়ে দিলেন।

অমৃত জ্যাঠামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, জ্যাঠামশাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে শমীককে বলল, "কি বাজে কথা বলছিস? ওষুধ খাবার ইচ্ছে হল না মানে? ওষুধ ওষুধ, তোর ইচ্ছে অনিচ্ছে আবার কী?"

ইন্দুলেখা একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভাশুর, বড় জা-র সামনে তিনি স্বামীর কাছাকাছি বসবেন না।

অমৃত বলল, "কী হবে সেটা ডাক্তার বুঝবে। তুই এমন এমন কথা বলিস! ললিতমামা তোকে মিছেমিছি ওষুধ খেতে দিয়েছেন।"

আশালতা বললেন, "সবটাই তোর নিজের খুশি? ইচ্ছে হলে করবি, না ইচ্ছে হলে করবি না?"

চারুপ্রসাদের যেন খেয়াল হল, শমীককে বাঁচাবার দায় তাঁর। উকিল যেভাবে জেরার মুখ থেকে মক্কেলকে সরিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করে চারুপ্রসাদ অনেকটা সেইভাবে বললেন, "ওষুধ খানিকটা রয়ে-সয়ে খাওয়া ভাল। আজকাল যা কড়া কড়া ওষুধ বেরিয়েছে

আমার তো খেতেই ভয় করে। সেদিন আমার কানাইয়ের মাথা ধরেছিল, কী-একটা ওষুধ খেল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফুলে চোখের পাতা ফুলে—যায় আর কি!" বলেই চারুপ্রসাদ আশালতার দিকে তাকালেন, বললেন, "কেন বউদি, তোমারই না একবার ঘাড়ে ব্যথার ওষুধ খেয়ে হাতের কমুইয়ের কাছটা ফুলে গেল।"

আশালতা অস্বীকার করতে পারলেন না। একবার সত্যিই এ-রকম হয়েছিল; বাতিল করে দিতে হল ওষুধটা।

চারুপ্রসাদ প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে পেরেছেন ভেবে দেবপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "আমার তো মনে হয় দু-একদিন সবুর করে শুরু করাই ভাল। ললিতদা ওকে ঘুমের ওষুধ খেতে দিল। এই বয়েসে ঘুমের ওষুধ?"

আশালতা বললেন, "তোমার ঠাকুরপো ওষুধ-বিষুধের ব্যাপারে সব সময় ভয়। নিজে পারতপক্ষে মুখে দিতে চাও না!"

"তা বলতে পার। আজকালকার কড়া কড়া ওষুধগুলো খেতে আমার ভয় হয়। শরীরকে খানিকটা নেচারের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। আমি তো শমীকে বলছিলাম, দিন দশ-পনেরো বাইরে গিয়ে থাকতে। এখন বাইরে যেখানেই যাবে—ভাল ক্লাইমেট। খাও দাও ঘুমোও, বেড়িয়ে বেড়াও—দেখতে দেখতে শরীর চাঙ্গা হয়ে যাবে।"

করবী বলল, "বারে, বাড়িতে বিয়ে আর ছোড়দা যাবে বাইরে বেড়াতে?"

অমৃত মুখ তুলল না।

"বিয়ের দেরি আছে—" চারুপ্রসাদ বললেন, "শমী কি তোদের বিয়ের বাজার করবে?"

আশালতা বললেন, "দেরি থাকলেও খুব আর দেরি কোথায়? তা শমী বাইরে যাচ্ছে কোথায়?"

শমীকই খেতে খেতে বলল, "কোথাও নয়।"

চারুপ্রসাদ খাওয়া-দাওয়ায় রুচি পান। কপির তরকারিটা তাঁর

ভালই লাগছিল। স্বাদ থেকে তিনি বুঝতে পারছেন, ইন্দুর হাতে রান্না। ইন্দু প্রায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শমীককে আবার যেন সামলাতে হবে। চারুপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বললেন, "তুই ভেবে দেখ না, আগে থেকেই মাথা নাড়ছিস কেন? এখন বাইরের জল-বাতাস টনিক। মোর দ্যান্ টনিক।" বলেই তাঁর কী মনে পড়ল, দেবপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাদা, তোমার মনে আছে—মার একবার বেরিবেরি হল, কলকাতায় তখন ঘরে ঘরে বেরিবেরি। বাবা আমাদের সকলকে জামতাড়ায় রেখে এলেন। সে একটা বিরাট ব্যাপার। ঠাকুর চাকর দরোয়ান, পাহাড় পাহাড় বিছানা বাক্স, মা তুমি আমি আর গৌরী—জামতাড়ায় গিয়ে তিন মাস থাকলুম। শীত কাটিয়ে ফিরলাম সব। তিন মাসে যা চেহারা হল আমাদের—এক-একটা ফুটবল…" চারুপ্রসাদ সরল মনে হাসলেন।

দেবপ্রসাদ অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। খানিকটা হালকা আবহাওয়ায় তাঁরও যেন আরাম লাগছিল। আগে এই খাবার টেবিলে রাত্রে সকলেই একসঙ্গে বসত; খাও আর না-খাও টেবিল ঘিরে থাকত সকলেই, কোনো রকম আড়ষ্টতা ছিল না, অস্বস্তি ছিল না, খেতে খেতে গল্প হত, মজার মজার কথা উঠত, সকলেই হাসি-তামাশা করত, শুধু ইন্দু খানিকটা আড়ালে থেকে চাপা গলায় সময় মতন মন্তব্য করত। শমী তার বাবাকেই কি কম জব্দ করত! পারিবারিক, সম্পূর্ণ নিজেদের এই মজলিস, আর তার সুখ যেন চলে গেল ধীরে ধীরে। দেবপ্রসাদ যদি চারুপ্রসাদকে হুকুম করেন, আজও যদি করেন, বলেন—'তোমার মক্কেলদের সাড়ে ন'টার পর বসিয়ে রাখবে না ঘরে, খাবার সময় এখানে থাকবে—'তা হলে চারুপ্রসাদের সাধ্য নেই তা অমান্য করেন। দাদার এতোটাই বাধ্য তিনি। কিন্তু দেবপ্রসাদ ছেলেমানুষ নন, তেমন হুকুম করেন না, চারুর কাজের ক্ষতি হবে এমন কাজ তিনি করতে পারেন না।

দেবপ্রসাদ বললেন, "বাবা যা করতেন সবই এলাহি করে। জামতাড়ায় খাবার-দাবারের অভাব ছিল না, সবই পাওয়া যেত; শীতকাল, তবু বাবা হপ্তায় একদিন করে টুকরি-বোঝাই তরিতরকারি ফল কলকাতা থেকে পার্শেল ভ্যানে করে পাঠিয়ে দিতেন। নারান দরোয়ান গিয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে আসত।"

চারুপ্রসাদ হঠাৎ হেসে উঠলেন। "আর মা এক-একদিন রেগে গিয়ে যত্ত তরকারি ফল সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে কুয়োর দিকটায় ফেলে দিত।"

দেবপ্রসাদ বললেন, "গোবিন্দঠাকুর আর আমরা দুজনে মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে কুড়িয়ে আনতাম।"

আশালতার লোভ হল স্বামীকে এই সুযোগে একটু খোঁচা দেন। চারুপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ওটা তোমাদের বংশের ধারা বাপু; রাগ হল কি হাতের সামনে যা পেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলে।"

দেবপ্রসাদ খোঁচাটা বুঝলেন। তাঁরও একসময়ে এই দোষটা ছিল, তবে ছোট-মার মতন নয়। কবে একটা চায়ের কাপ, দুধের গ্লাস, চিনেমাটির ফুলদানি তিনি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভেঙেছেন সেটা বড় কথা নয়।

চারুপ্রসাদ বউদির কথাটা বুঝতে পেরে চাপা হাসি হাসছিলেন।

দেবপ্রসাদ ঠাট্টা করে বললেন, 'ছুঁড়ে ফেলাটাই আমরা শিখেছি এটা যদি সত্যি হত তবে তো কিছুই আর এ বাড়িতে থাকত না, কী বলো চারু।"

চারুপ্রসাদ হাসিমুখে বৌদির দিকে তাকালেন।

শমীক একটু জল খেল। লংকা চিবিয়ে ফেলেছে। ঝাল লাগছিল। ঝাল লাগলেই তার হেঁচকি উঠতে শুরু করে।

অমৃতর খাওয়া শেষ। করবী মাঝে মাঝে এঁটো শুকনো আঙুল জিবে ছোঁয়াচ্ছিল, এটা তার মুদ্রাদোষ।

ইন্দুলেখা কিছু বুঝি আনতে বলেছিলেন ঠাকুরকে। ঠাকুর এনে

দেবার পর তিনি আবার টেবিলের সামনে এসে শমীক আর স্বামীর থালার পাশে রেখে দিচ্ছিলেন।

শমীক বলল, "এটা কী?"

"ক্ষীরকমলা।"

"বাঃ।"

আশালতা আবার ছেলের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, "শমী, তুই তবে ক'দিন জামতাড়া থেকে ঘুরে আয় না। তোর পিসীদের বাড়ি পড়ে আছে।"

করবী বলল, "আমাকেও নিয়ে চল ছোড়দা।"

অমৃত বলল, "মামণিকেও নিয়ে যা।" আশালতাকে ওরা মামণি বলে।

আশালতা বললেন, "হ্যাঁ, আমার এখন যাবারই সময়..."

দেবপ্রসাদ ভাইকে বললেন, "তোমার কানাইকে কাল একবার দ্বিজুর কাছে পাঠাতে পারবে?"

"দ্বিজু আমায় খবর দিয়েছে। পরশু আসবে।"

"বাড়িঘরের কাজকর্ম, রঙ এখন থেকে শুরু না করলে আর সময় পাওয়া যাবে না।'

শমীক হঠাৎ তার কাকাকে বলল, "এটাও কি তোমাদের বংশের ধারা?"

চারুপ্রসাদ প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না; তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর ধরতে পারলেন কথাটা। "বাড়ি রঙ করার কথা বলছিস?"

"হ্যাঁ," শমীক মাথা নাড়ল।

"বাড়ি সারানো, চুনকাম, রঙ—এর মধ্যে বংশের ধারার কী আছে?"

"না, জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের বাড়িতে বিয়ে-থা হলেই দেখছি মাসখানেক ধরে মিস্ত্রি-মজুর খাটে।"

দেবপ্রসাদ হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন বললেন, "বাড়ি রাখতে হলে তার পেছনে যত্ন নিতে হয়। বিয়ে-থা উপলক্ষ করে লোকে সেটা করার চেষ্টা করে।"

"আগে বা পরে নয় ?"

"মানে ?"

"বাড়িতে চুনকাম কিংবা রঙ বিয়ে-থা না হলে করা যায় না ?"

চারুপ্রসাদ বললেন, "করা যাবে না কেন। বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ। একবার মিস্ত্রি-মজুর বাড়িতে ঢোকালে তাদের আর সহজে বের করা যায় না। কাজেই করব-করছি করতে করতে একটা উপলক্ষ এসে পড়ে। তা ছাড়া, বিয়ে-থার সময় ঘরদোর পরিষ্কার হয়ে যায়, দেখতেও তো ভাল লাগে।"

শমীক বলল, "আসলে এগুলো কাজ চালানো কথা। তোমরা এটাই দেখেছ, শিখেছ। তোমাদের বাবা নিশ্চয় তোমাদের বিয়ের সময় বাড়ঘর রঙ করাতেন—তোমরাও তাই করছ।"

কথাটা সত্যি। ঈশ্বরদাস নিজের দ্বিতীয় বিবাহের সময় এবং বড় ছেলের বিয়ের সময় গৃহ সংস্কার করেছিলেন। অবশ্য মধ্যেও তাঁকে করতে হয়েছে। ছোট ছেলে ও মেয়ের বিয়ে তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি।

দেবপ্রসাদ জলের গ্লাস তুলে নিয়ে বললেন, "তাই করছি। এতে তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে ?"

"কিচ্ছু না। অসুবিধের কথাই উঠছে না। শুধু অভ্যেসের ব্যাপারটা দেখছি। দিদির বিয়ে হবার অন্তত দশ বছর পরে পুরবীর বিয়ে হল। এই দশ বছরে তোমরা বাড়িতে হাতই দাও নি..."

দেবপ্রসাদ চুপ করে থাকলেন, জল খেতে লাগলেন।

চারুপ্রসাদ কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আশালতা বললেন, "বাড়িঘর নিয়ে যা করার বাড়ির কর্তারা করবে, বুঝবে। তুই ছেলেমানুষ—তোর এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।"

শমীক বলল, "যা হয়ে এসেছে তাই হয়ে যাবে—তার নড়চড় হবে না এ-বাড়িতে এটাই আমার খারাপ লাগে।"

দেবপ্রসাদ গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন, "আমরা আমাদের বাপ-ঠাকুরদার পথ ধরে চললাম, তোমরা তোমাদের সময় নিজের পথে চলো।"

"তোমাদের বাপ-ঠাকুরদার পথটা যে ভাল ছিল তা বলতে পারবে না।"

দেবপ্রসাদ কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতেই পারেন নি—তাঁর কথার জবাবে ছেলে এমন একটা কথা বলতে পারে। শমীক মাঝে মাঝে পূর্বপুরুষদের নিয়ে হাসিঠাট্টা আগেও করত, সেটা হাসি ঠাট্টাই, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আজ শমী তা করছে না। অন্য আরও যেন কিছু আছে। দেবপ্রসাদ বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন।

চারুপ্রসাদ, আশালতা, এমনকি ইন্দুলেখাও কথাটা কানে ধরে রেখেছিলেন। অমৃত কেমন অবাক হয়ে ছোট ভাইকে দেখছিল। করবীও।

দেবপ্রসাদ ছেলের দিকে সরাসরি তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "আমাদের বাপ-ঠাকুরদার পথ কেমন ছিল সেটা তুমি আমাদের শেখাবে?"

"শেখাব কেন! তোমাদের শেখবার বয়েস শেষ হয়ে গেছে। আমরা তোমাদের শেখাতে পারব না। কিন্তু বলব।"

"কী বলবে?"

"পথটা ভাল ছিল না।"

"কেন?"

শমীক দু মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তুমি আমার ওপর রাগ না করে তোমার নিজের বাপ-ঠাকুরদার কথা ভেবে দেখ।"

"দেখেছি। তুমিই বলো।"

শমীক এবার কাকার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "একটাই বলি। আচ্ছা কাকা, তুমিই বলো, কোর্টের একটা পেশকার সে আমলে এমন কী রোজগার করত যাতে কলকাতায় একটা বাড়ি তৈরী করে ফেলতে পারে?"

চারুপ্রসাদ কিছু বলার আগেই দেবপ্রসাদ বললেন, "সে আমলের সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?"

"একটু-আধটু আছে। তোমরা যতই বলো, পেশকারীর মাইনেতে ওটা হয় না।"

দেবপ্রসাদ কথার অর্থটা ধরতে পারলেন। তাঁর মুখের ফরসা রঙে কালচে আভা ধরতে শুরু করেছিল। তাঁর মনে হল, এটা অপমান। শমীক তাঁদের পূর্বপুরুষকে অপমান করছে।

চারুপ্রসাদও কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা কোন দিকে গড়াচ্ছে বোঝবার আগেই দাদার দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, শমী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ভাইপোকে সামলাবার চেষ্টা করলেন চারুপ্রসাদ। বললেন, "না না, তখন সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল, পনেরো-বিশ টাকা রোজগারেতেই বড় সংসার চলে যেত।···এই তো, যুদ্ধের আগে আমরাই দেখেছি ফার্ন রোড একডালিয়া-বালিগঞ্জের এইসব জায়গা পাঁচ-সাতশো টাকা কাঠা বিক্রী হয়েছে।"

শমীক বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের এই স্কট লেনের বাড়ির জমি তা হয় নি। তোমাদের ঠাকুরদা খাস কলকাতায় বাড়ি করেছিলেন।"

দেবপ্রসাদ রেগে গিয়েছিলেন। বললেন, "তুমি যা বলতে চাইছ বুঝতে পারছি। তুমি আমাদের ঠাকুরদাকে ডিসঅনেস্ট বলতে চাইছ। শোনো—যিনি গড়ে দিয়ে গিয়েছেন তাঁকে নিয়ে কথা বলা তোমার শোভা পায় না।"

শমীক খাওয়া শেষ করে ফেলল। বলল, "তোমাদের এই

ব্যাপারটা আমি মানি না। তোমাদের সুবিধে তৈরী করে দিয়ে গিয়েছেন বলেই কেউ সাধু মহাপুরুষ হয় না।"

আশালতা ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর তো, খালি তর্ক আর তর্ক। বাপ-ঠাকুরদার নিন্দে করলে তোরও নিন্দে হয়।"

"কে বলেছে হয় না?" শমীক জবাব দিল।

দেবপ্রসাদ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুমি কী মানো না-মানো তাতে আসে যায় না। কে সাধু কে সাধু নয় সে বিচার করবার অধিকারও তোমার নেই। তুমি অনেক ছোট, ওঁরা অনেক বড়।"

শমীক বলল, "আগে জন্মেছে বলে বড় বলছ? না গুণের জন্যে বলছ?"

দেবপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চারুপ্রসাদও যেন কেমন চমকে উঠলেন। শমীকের গলার এই স্বর যেন তিনি আগে কখনও কখনও শুনেছেন। কিন্তু এমন তীব্র নয়, এতোটা ধারালো নয়।

আশালতা অপলক তাকিয়ে থাকলেন, ইন্দুলেখার মাথার কাপড় যে আলগা হয়ে গিয়েছে তিনি খেয়াল করতে পারলেন না।

অমৃত আর রুবরী বোকার মতন বসে থাকল।

দেবপ্রসাদ আর ঘরে থাকতে পারলেন না। সমস্ত ঘর থমথম করতে লাগল।

ছয়

শমীক যে কাণ্ডটা ঘটাল সেটা বাড়ির লোক ভুলে যেতে পারত যদি না সে আরও বাড়াবাড়ি শুরু করত। নিজের পূর্বপুরুষ এমনকি জীবিত আত্মীয়স্বজন নিয়ে রঙ্গ-তামাশা সে অজস্র বার করেছে; এটা তার স্বভাবের মধ্যে ছিল। কখনো-সখনো গুরুজনদের কেউ হয়ত এতে সামান্য ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু সে-সব কথাবার্তায় গুরুত্ব

দেন নি। হালকা ভাবেই ব্যাপারটা নিয়েছেন, হালকাভাবেই কেটে গেছে সব। এবারও সে-রকম হতে পারত। হল না, কারণ শমীকের এবারের খোঁচাটা ঠিক তামাশার মতন ছিল না। সে যেন ইচ্ছে করেই আঘাত দিতে চেয়েছিল। তার বলার ভঙ্গি, গলার স্বর ছিল আক্রমণের। চারুপ্রসাদ সেটা স্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন; অন্যরা অস্পষ্টভাবে।

তা ছাড়া শমীকের ইদানীংকার হাব-ভাব বাড়ির লোককে প্রথমে বিস্মিত করলেও ক্রমশই তা তাদের উদ্বেগ এবং বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। প্রশ্রয়ের সীমা আছে, ধৈর্যের মাত্রা আছে। শমীক যেন সেই সীমা এবং মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেবপ্রসাদ, অংশালতা, ইন্দুলেখা যে উৎকণ্ঠার অবস্থায় এসে পড়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। শমীক চারদিক থেকে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলেছিল যে তাকে আর হালকাভাবে নেওয়া গেল না।

শমীক নিজেও হয়ত আগে অতটা স্পষ্ট করে বোঝে নি সে কী করতে চলেছে। যখন বুঝল তখন আর ফিরে তাকাল না।

মৃদুলা একদিন শমীককে ফোনে ডেকে বলল, "এই, কাল তুই আমাদের বাড়ি আসবি। সকালেই আসবি। এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি। বিকেলে আমরা কোথাও যাব।"

শমীক ফোনে মুখ রেখে বলল, "কেন?"

একটু চুপ করে থেকে মৃদুলা বলল; "তোকে নেমন্তন্ন করছি।"

"তোর জন্মদিন?"

"বলব না।"

"যদি জন্মদিন হয় তাহলে তোর নেমন্তন্ন আমি নিচ্ছি না।"

"বাজে বকবি না, নিজের জন্মদিনের নেমন্তন্ন নিজে কেউ করে না জানিস।"

"তবু তুই করছিস?"

"বেশ করলাম।"

"শোন, আমি কাল যেতে পারব না।...প্রার্থনা করছি, তোর জন্ম সার্থক হোক।" শমীক যেন হেসে বলল।

মৃদুলা সামান্য চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেন, কাল তোর কী?"

"আমি এখন প্রচণ্ড ব্যস্ত।"

"কিসে ব্যস্ত? কী করছিস তুই?"

"মামলা সাজাচ্ছি।"

"মামলা—?"

শমীক বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে বাঁ চোখের পাতা টিপে ধীরে ধীরে বলল, "আমি একটা মামলা প্লেস করছি, বুঝলি?"

মৃদুলা কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। চুপ করে থাকল খানিক, তারপর বলল, "তুই কোর্টে বেরোচ্ছিস? কবে থেকে? সেদিনও কিছু বলিস নি তো?"

শমীক মৃদুলার কৌতূহলের কোনো জবাব দিল না। সামান্য থেমে বলল, "মৃদু, তুই কিছু মনে করিস না। জন্মদিন-টিন গোছের আদিখ্যেতা আমার ভাল লাগবে না। আমার মনটনও ভাল নেই। পরে তোকে বলব। তুই বরং একদিন আয় আসছে হপ্তায়।"

মৃদুলার নিঃশ্বাসের শব্দটাও যেন কানে এসে লাগল শমীকের। মৃদুলা খুব ধীরে বলল, "আচ্ছা, পরে ফোন করব।"

শমীক টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

দেবপ্রসাদের ঘরের সামনে পুবের বারান্দায় ফোন থাকে। এটা বাড়ির লোকের ব্যবহারের জন্যে। চারুপ্রসাদের ফোন থাকে নীচে তাঁর অফিস-ঘরে।

ফোন রেখে শমীক যখন ফিরে আসছে, বাবাকে দেখতে পেল। মনে হল, বাবা নীচে বৈঠকখানায় কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন, কথাবার্তা শেষ করে উঠে আসছেন। হাতে একটা

এক্সারসাইজ বুক, আর ফাউন্টেন পেন। দাদার বিয়ের নানা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে লোকজন আসে, বাড়ির পুরোনো স্যাকরা রক্ষিতমশাই থেকে জেলেপাড়ার কাতুদা, যে নাকি দি'দর বিয়ে থেকে শুরু করে সব রকম বড় অনুষ্ঠানে এ-বাড়িতে মাছটাছ দেয়। কাতুদার বাবা নাকি দেবপ্রসাদের বন্ধু ছিলেন ছেলেবেলায়।

দেবপ্রসাদ আরও একটু এগিয়ে এসে থামের কাছটায় দাঁড়ালেন। বারান্দার থামগুলো গোল ধরণের। বেলা এখনও বেশী নয়; পাঁচিল ঘেঁষে রোদ ছড়ানো। ছাদের দিকটায় আগাগোড়া কাঠের খড়খড়ি সবুজ, রঙ করা। সমস্ত বারান্দাটাই বেশ নিরিবিলি অথচ পুরোপুরি ঘরোয়া। দু-চারটে পাতাবাহারের টব বারান্দার পাঁচিল ঘেঁষে, নীচে থেকে উঠে-আসা জুঁই গাছের ডালপালা একটা থাম জড়িয়ে রয়েছে, বড় একটা পাখির খাঁচা, কয়েকটা মুনিয়া পাখি। দেবপ্রসাদ দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই এই বারান্দায় বসে কাটান। একপাশে তাঁর ইজিচেয়ার, আরও কত টুকিটাকি পড়ে থাকে।

কিছু যেন মনে পড়ে যাওয়ায় দেবপ্রসাদ দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। একটু সময় দাঁড়ালেন, একবার পেছনের দিকে তাকালেন, তারপর আবার কী মনে করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

এমন সময় আবার ফোন বেজে উঠল।

শমীক কাছাকাছি ছিল। ফোন ধরল।

"মামা? ··ধরো, বাবাকে দিচ্ছি।"

দেবপ্রসাদ কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। শমীক বাবার দিকে তাকিয়ে। মুখের সামনে ফোন।

"আমি আর-একদিন তোমার কাছে যাব···দরকার আছে।···না, মোটেই না।·ধরো, বাবাকে দিচ্ছি।" শমীক মুখ থেকে ফোন সরিয়ে দেবপ্রসাদের দিকে তাকাল, "মামা—!" ফোনের হাতটা বাড়িয়ে দিল শমীক।

দেবপ্রসাদের বাঁ হাতে নিবন্ত চুরুট, চশমার খাপ। খাপটা জামার পকেটে রেখে ফোন ধরলেন।

শমীক আর দাঁড়াল না।

নিজের ঘরে ফিরে আসবার সময় করবীকে দেখতে পেল। রাশীকৃত শাড়ি জামা চাদর জড় করে করে তার ঘরের সামনে রাখছে। ধোপা এসেছে বোঝাই যাচ্ছে। এই একটা কাজ করবীর। বাড়ির কার কী ধোপার বাড়ি যাবে তা দেখেশুনে ধোপাকে দেওয়া, খাতায় লেখা, যা এল তা মিলিয়ে নেওয়া।

করবী বলল, "ছোড়দা, তোর কী যাবে ঠিক করে রাখ, আমি আসছি।"

শমীক নিজের ঘরে এল।

ঘরে আসতে আসতে শমীক মৃদুলার কথাই ভাবছিল। রাগ করল মৃদুলা? দুঃখ পেল। অভিমান করবে নিশ্চয়। উপায় কী। শমীকের আর এসব ভাল লাগে না। মৃদুলার সঙ্গে পরে দেখা হলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে।

নিজের চেয়ার টেবিলের সামনে গিয়েই শমীক বসল। তার এই টেবিলটা প্রায় কাকার টেবিলের চেহারায় দাঁড়িয়েছে। কত রকম যে জিনিস, কয়েকটা বই, নানা ধরনের কাগজপত্র, ডট পেন, কলম, অ্যাশট্রে, সাদা কাগজের ওপর আঁকা কিম্ভুতকিমাকার জীবের ছবি, আরও কত কী।

শমীক অন্যমনস্কভাবে চেয়ার টেনে বসল। মুখোমুখি জানলা। শীতটা বেশ পড়েছে। ডিসেম্বর মাসের অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে, সামনেই ক্রিসমাস। শীত এখন বাড়বে।

সুধাংশুরা দল বেঁধে জামসেদপুর বেড়াতে যাচ্ছে ক্রিসমাসে। সেদিন ওরা দু-তিনজন এসেছিল, অনেকক্ষণ আড্ডা মারল শমীকের সঙ্গে। বলল, তুই চল। অনেক দিন একসঙ্গে হল্লা করা হয় নি। শালার চাকরি আর বাড়ি, বাড়ি আর চাকরি—আর ভাল লাগছে না।

শমীক রাজী হয় নি। "তোরা যা—"

"কেন, তোর কী হল? তুই তো বেকার।"

"হল্লা করবার সময় আমার নেই।"

"বাড়িতে বিয়ে?"

"না, বিয়ে নয়; আমার অন্য কাজ আছে।"

প্রণব বলল, "শমী, তুই তোর স্বভাবটাই পালটে ফেললি। ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস কেন, হয়ে গিয়েছিস বলা যায়। জীবনে এত সিরিয়াস হওয়া ভাল নয়। লাইফের এখন বহু পড়ে আছে, যদি হতেই হয়, পরে হব। এখন কেন?"

শমীক হেসে বলল, "রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি গড়ার মতন বসে থাকতে বলছিস?"

"থাকবি না-হয় বসে। ক্ষতিটা কী?"

"লাভই বা কোথায়। জীবনের এখনও অনেক আছে—এটাই বা কী করে জানব বল? কে বলতে পারে আর বেশীদিন নেই।"

সুধাংশু বলল, "তুই যা চেহারা করেছিস তাতে অবশ্য ওটা সন্দেহ হয়।...তোর ট্রাবলটা কী?"

হেসে শমীক বলল, "মাথার।"

সুধাংশু বলল, "ওটা নতুন নয়। মাথাটা ফেলে দে।"

"বেশ বলেছিস।"

সুধাংশু একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি একেবারে বাজে কথা বলি নি। মাথা সুস্থ রেখে বাঁচার দিন ফুরিয়ে গেছে, শমী। মাথাটাকে বাদ না দিলে বাঁচা যাবে না।"

"এত বাচায় কী লাভ?"

"জানি না।"

কী লাভ এই বেঁচে থাকায়?

"ধরে নাও আমরা একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে হাঁটছি। এটা

কেন, কি জন্যে তা জানার আগেই তুমি দেখতে পেলে, পেছন থেকে একপাল বুনো ঘোড়া ছুটে আসছে, আর সামনে গুড়গুড় করে এগিয়ে আসছে ট্যাংক। এ-রকম অবস্থায় তোমার পক্ষে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নীচের জল গভীর অগভীর যা-ই হোক, বিশাল বিশাল পাথরে তোমার মাথা ফাটুক না-ফাটুক, হাড়গোড় ভেঙে যাক না-যাক—আত্মরক্ষার জন্যে তোমায় এই ঝাঁপ দিতেই হবে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দরুনই আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, বুদ্ধির দ্বারা নয়। আমরা কয়েকটা জোয়ান ছেলে যখন আকাশে ওড়ার কসরত দেখাতাম - তখন এই প্রবৃত্তিটাই কাজ করত, আমাদের জীবনটা ছিল সাঁকোর ওপরে, যার দুদিকেই সমান বিপদ। অল্পক্ষণের জন্যে বেঁচে থাকা, আর সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে টেবিলে সাজানো অখাদ্য খাবারগুলো থেকে যা পাওয়া যায় তুলে নেওয়া ছাড়া আর কী করা যেতে পারে?···আমরা বেঁচে ছিলাম এই বোধ আমাদের ছিল না, আমরা মরে যাচ্ছি এই উদ্বিগ্নতা সম্বল করে দিন কাটাচ্ছিলাম।"

শমীক যেন জানলার সামনে শীতের রোদে লোরেনজোকে স্বপ্নের টুকরো দৃশ্যের মতন দেখতে পাচ্ছিল। দমকা হাওয়া এসে শব্দ তুলছিল সাবুগাছের মাথায়।

করবী ঘরে এসেছিল। বলল, "তোর কী কী যাবে, ছোড়দা?"

শমীক কথা বলল না।

করবী দাদাকে দেখল। অপেক্ষা করল। আবার বলল, "কী কী যাবে?"

শমীক বলল, "সব।"

"স-ব!"

খেয়াল হল শমীকের। হাত দুটো মুখের ওপর এনে মুখ ঢাকল। বলল, "নিয়ে যা, যা তোর ইচ্ছে।"

করবী আলনা থেকে জামা, প্যান্ট, পাজামা বেছে বেছে তুলে

নিতে লাগল। শমীক একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল।

করবী বলল, "মৃদুলাদির বাড়িতে আমায় একদিন নিয়ে চল্ না।"

"নিজেই চলে যা ...।"

"বাঃ, নিজে কী করে যাব। আমি কি ও'দিকের কিছু চিনি?"

"চিনে নিবি।"

"তুই নিয়ে যাবি না? মৃদুলাদিকে কতদিন দেখি নি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে।... বললাম তুমি একদিন পুরোনো পাড়ায় এসো না। তা কী বলল জানিস? বলল, কেন যাব? তোরা পাড়া থেকে তাড়িয়েছিস, তোরা আসবি।" বলতে বলতে করবী বিছানার দিকে গিয়ে শমীকের বিছানা থেকে বেডকভার চাদর-টাদর তুলতে লাগল।

শমীক কোনো জবাব দিল না। মৃদুলার বাবা এ-পাড়া ছেড়ে চলে গেলেন ছোট ভাইয়ের জন্যে। ওঁদের কিছু সাংসারিক অশান্তি ছিল। ছোট ভাই আর ভাইয়ের স্ত্রী বড় গণ্ডগোল শুরু করেছিলেন। দোতলা ছোট বাড়িটা ভাগাভাগির যে বাসনা করেছিলেন তা আর শেষ হল না। অগত্যা বাড়ি বেচে দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে যে যার পথ ধরলেন। মৃদুলার বাবা চাকরি করতেন এ জি বেঙ্গলে। যা-কিছু বাড়ি বেচে পেয়েছিলেন আর যা চাকরি থেকে হাতে এসেছিল, সব মিলিয়ে-মিশিয়ে নাকতলার বাড়ি।

করবীর গলা পেয়ে শমীক ঘাড় ঘোরাল।

"এটা কী রে?"

শমীক দেখল। করবী চটিমতন একটা বই হাতে করে দাঁড়িয়ে। দেখছে।

শমীক বলল, "পাতা ছেঁড়া, খুব সাবধান..."

"এ কী বই রে?"

"তোর ঠাকুরদার এক বন্ধুর লেখা বই..."

"আমার ঠাকুরদার ?" করবী বইটার এ পাতা ও পাতা দেখছিল। বলল, "আমার ঠাকুরদা তোর ঠাকুরদা নয় ?"

শমীক কী ভেবে বলল, "হ্যাঁ, আমাদের।"

করবী বইটা রেখে দিল। এখন তার সময় নেই। পরে দেখবে। অবশ্য তার এই বইয়ের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই।

ধোপার বাড়িতে দেবার মতন যা জুটল বুকের কাছে জড় করে চলে যেতে যেতে করবী বলল, "আমি পরে এসে তোর কাচা চাদর-টাদর পেতে দিচ্ছি।"

শমীক আবার জানলার দিকে তাকিয়ে সিগারেট খেতে লাগল।

সেই একই রোদ, গাঢ় অথচ মোলায়েম; সেই একই আকাশ—নীল; সাবু গাছের মাথার ওপর দিয়ে কাক উড়ে গেল, গলি দিয়ে হর্ন বাজিয়ে ট্যাক্সি যাচ্ছে. বাতাসে কোথাকার জমা ময়লার একটা গন্ধও যেন ভেসে এল।

ঈশ্বরদাস এই বাড়ির মাথাটা উঁচু থেকে আরও উঁচুতে তুলে ধরবার সময় কি কোনোদিন ভেবেছিলেন, রোদ আকাশ যেমনই থাকুক—একদিন আশেপাশের জমা জঞ্জাল থেকে বাতাসে চাপা গন্ধ ভেসে আসবে ?

ভাবেন নি। কিন্তু শমীক সে গন্ধ পাচ্ছে।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিল শমীক। দিয়ে নীচু মুখে বসে থাকতে থাকতে টেবিলের ওপর থেকে অন্যমনস্কভাবে একটা রঙীন সই-কলম তুলল। দাদাকে কে যেন দিয়েছিল দু সেট। দাদা আবার তাকে এক সেট দিয়েছে। শমীক মুখের দিকের ঢাকনাটা খুলে কলমের পেছনে গুঁজে দিয়ে তার সামনের পড়ে থাকা কাগজটার ওপর আঁক কাটতে লাগল।

সেই কিম্ভূতকিমাকার জীব—যার হাত-পা আছে কি না বোঝা যায় না. হয়ত আছে, যার চোখ বা নাকের, মাথা বা মুখের কোনো সঙ্গতি নেই, সৌষ্ঠব নেই, যার পিঠ তক্ষকের মতন দেখাচ্ছে—শমীক

সেই বিসদৃশ জীবের এখানে-ওখানে মোটা করে রঙ বোলাতে লাগল।

বোলাতে বোলাতে যখন সেটা আরও বীভৎস হয়ে গেল—তখন শমীক কলম তুলে পাশের একটা জায়গায় লিখল: ঈশ্বরদাস।

তারপর ছেলেবেলায় যেভাবে অক্ষর বোলানোর অভ্যেস করতে হয়—সেইভাবে বার বার ঈশ্বরদাস, ঈশ্বরদাস, ঈশ্বরদাস লিখতে লিখতে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল।

করবী ঘরে এসে দেখল, শমীক দু হাত গালে দিয়ে চুপ করে বসে আছে।

বলল, "তোর আলমারির চাবি কোথায় রেখেছিস? চাদর বার করব।"

শমীক জবাব দিল না প্রথমে। পরে বলল, "খুঁজে দেখ। চাবিটাবি আমায় দিস না আর।" শমীক উঠে পড়ল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নীচে নেমে এল শমীক। উত্তরের বড় দালান ঘেঁষে বিস্তর জিনিস জমা হচ্ছে, বাইরের ফাঁকা জমিটুকুতে বাঁশ এনে ফেলেছে দ্বিজুবাবুর লোকরা। বাড়ি মেরামতি, রঙচঙের কাজ কালপরশু থেকেই শুরু হবে হয়ত। এতবড় বাড়ির ঘরে বাইরে, দালানে, বারান্দায় চুনকাম আর রঙের কাজ করতে সময় কম লাগবে না। দরজা-জানলাতেও রঙ করা রয়েছে। তার ওপর টুকটাক মেরামতি।

নীচের ঘরগুলোর একপাশে ঠাকুর-চাকররা থাকে। বুড়ো ভোলাদা। এ-বাড়ির ড্রাইভার। অন্য মহলে পেছন দিকে আগে হেঁসেল ছিল। এখন পাইকারী হেঁসেলটা নীচে থাকলেও বিশেষ রান্নাবান্নার ব্যবস্থাটা দোতলায় চলে গেছে। মা বা কাকিমা কেউ আর বার বার একতলা দোতলা করতে পারে না।

সদর দিয়ে ঢুকলে পেছনের এই হেঁসেল চোখে পড়ার কোনো

সম্ভাবনা নেই। সরু সরু লোহার থামের গা ধরে বারান্দা-বরাবর কাঠের খড়খড়ি করা জাফরি।

শমীক বৈঠকখানার দিকে চলে গেল।

চারুপ্রসাদের মক্কেল নিয়ে বসার অফিসঘর একপাশে, অন্য পাশে এ-বাড়ি। বারোযারী বৈঠকখানা। বাইরের লোক এলে বসে। পুরোনো আসবাবপত্রের সঙ্গে নতুন আসবাব মিলিয়ে সাজানো। দেওয়ালে সেকালের মস্ত মস্ত ছবি। কাচ লাগানো দেওয়াল-আলমারির কাঠগুলো এখনও চমৎকার পালিশ দেয়।

এই বৈঠকখানা ছিল ঈশ্বরদাসের। লোকজনের সঙ্গে ওই ঘরে বসে তিনি দেখা করতেন, কথাবার্তা বলতেন। মারাও যান ওই ঘরে বসে। কার সঙ্গে বসে যেন কথা বলছিলেন, হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করে উঠে দাঁড়াতে যান। বার দুয়েক জোরে জোরে হাঁচেন, আর সামলাতে পারেন নি, তারপর পড়ে যান। সেই পড়াই শেষ পড়া। মাথার মধ্যে শিরা ছিঁড়ে যায়। মানে সেরিব্রাল হেমারেজ।

শমীক বৈঠকখানায় গেল না। পাশের ঘরটার দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। ঘরটা এখনও প্রায় অন্ধকার। কাচের শার্সি বন্ধ; কাঠের খড়খড়ি কোনোটা খোলা পড়ে আছে, কোনোটা বন্ধ।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে শমীক কয়েকটা শার্সি খুলে দিল। আলো এল। শীতের বাতাস ঢুকল।

এই ঘরের সঠিক কোনো ইতিহাস নেই। হয়ত ঈশ্বরদাসের বাবার শোবার ঘর ছিল এটাই, হয়ত এই ঘরেই ঈশ্বরদাস ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কেউ কিছু জানে না। জানার দরকার করে না। কেননা ঈশ্বরদাসের বাবার গাঁথা দেওয়ালের কাঠামোটুকু মাত্র বজায় রেখেছিলেন ঈশ্বরদাস, তারপর যা-কিছু যোগসাধন, দৈর্ঘ্যে এবং উচ্চতায় সবই তিনি করেছেন।

এই ঘর কখন কী কাজে লেগেছে জানা না গেলেও বাড়ির নানা টুকিটাকি-ছাটকা কাজে ঘরটা ব্যবহৃত হত। বাবা-কাকা ছেলেবেলায়

এই ঘরে বসে মাস্টারের কাছে পড়াশোনা করতেন। পিসীমা এই ঘরে রথ সাজাত, পুতুলের বিয়ে দিত। ছোটঠাকুমা—মানে মনোরমা—এই ঘরে কাকাকে একদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তালা বন্ধ করে রেখেছিল।

শমীক মনে করতে পারে, তার ছেলেবেলায়—বাড়িতে যখন লোকজন বেশী ছিল—এই ঘরটা একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকত না দিনের পর দিন। কোনো-না-কোনো কাজে মাঝে মাঝেই ব্যবহার করা হত।

এখন কিছুই হয় না। দরজা জানলাও খোলা হয় না রোজ। পড়ে আছে তো আছেই, ধুলো জমছে, পুরু হয়ে উঠছে।

দু-তিন পুরুষের নানা ধরনের অব্যবহৃত জিনিসের গুদোম হয়ে উঠেছে ঘরটা এখন। বই, ছবি, ভাঙা সেজবাতি, ঈশ্বরদাসের দোকানের কিছু কিছু বাহারী আসবাব, অচল ওয়ালক্লক, কাঁচের বাসন, বাবা-কাকার বাল্যকালের দু-পাঁচটা বই, পিসীমার এক-আধটা ভাঙা পুতুল, কাকার আইনের জীর্ণ বই, আরও কত কী।

শমীক এই ঘরে আজ কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝেই আসছে। আসছে কোনো কিছু খুঁজতে। খুঁজে খুঁজে দেখতে।

তার লোভ পুরোনো বইপত্রের ওপর, কাগজ-টাগজ চিঠিপত্রের ওপর। ঈশ্বরদাস শৌখিন লোক ছিলেন, শৌখিনতার দরুন হোক বা আভিজাত্য রক্ষার জন্যে হোক তখনকার দিনের অনেক বইপত্র মরক্কো চামড়ায় বাঁধিয়ে রেখেছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সাহেবদের আঁকা ছবি-টবিও রেখেছেন। কোনোটা বাঁধিয়েছিলেন, কোনোটা পাকিয়ে ফেলে রেখেছেন। কলটানা ডায়েরীতে লেখা হিসেবপত্রের দু-চারটে খাতাও পড়ে আছে এখনও, ব্যবসা-সংক্রান্ত এবং অন্য ধরনের কিছু চিঠিপত্র, আরও কত কিছু।

এগুলো এভাবে থেকে যাবার কারণ, বাড়ির লোক এদিকে দৃষ্টি দিতে চায় নি। হয়ত একসময় পিতার স্মৃতি হিসেবেই দেবপ্রসাদরা এগুলো রাখতে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন একপাশে পড়ে আছে থাক। পরে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে চান নি। ভুলেও গেছেন। ঘরদোর রঙ-চঙ করার সময় জিনিসপত্র সরাতে গিয়ে কিছু হারিয়েছে, কিছু থেকে গেছে। যা থেকে গেছে তার সম্পর্কে এ-বাড়ির কোনো উৎসাহ নেই, ভাবপ্রবণতা যদি বা থাকে আছে হয়ত।

জানালা খুলে দেওয়ায় ঘরের বন্ধ বাতাস ক্রমশই তার ভারী চাপা ধুলোর গন্ধ হারাচ্ছিল। শমীক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর একটা উঁচু টুলের ওপর বসল। বসে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল। দেওয়ালে ঝুল জমেছে অনেক, কাঠের কয়েকটা র‍্যাকের মাথায় হাত রাখলে আঙুল ধুলোয় ডুবে যাবে। সেকালের চোঙাঅলা রেডিয়োর ধড়টা পড়ে আছে র‍্যাকের মাথায়, মাকড়সার জাল জমেছে চোঙার মধ্যে।

শমীক লক্ষহীন ভাবে তাকাতে লাগল। দেওয়াল-আলমারির মধ্যে এলোমেলো করে রাখা বই, মাসিকপত্র, চীনেমাটির ভাঙা পুতুল, কেউ হয়ত রেখেছিল। র‍্যাকেও কিছু কিছু কাগজপত্র আর বই।

শমীক এখানে যা খুঁজতে এসেছে তা কতটা পাবে আর পাবে না তার জানা নেই। কাকাকে শমীক বলেছিল, 'তোমাদের বংশের কথাটা আমায় বলবে?'

চারুপ্রসাদ বলেছিলেন, 'কেন, তুই জানিস না?'

'নামে জানি—।'

'আর কিসে জানবি? তুই কী দেখেছিস তাঁদের? তবে?'

'দেখতে চাই।'

'দেখতে চাই মানে—। যারা নেই তাদের কী করে দেখবি?'

'মন দিয়ে দেখব, বুদ্ধি দিয়ে।'

'কেন ?'

'কেন !...তুমি সেই বিখ্যাত লাইনটা জানো না; গঙ্গা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? সেই রকম। আমি কোথা থেকে এসেছি তার বৃত্তান্তটা জানতে চাই।'

'বড় বংশ থেকেই এসেছিস ! যা, আর জ্বালাস না।'

'উঁহু ! এটা আমায় জানার চেষ্টা করতে হবে।'

'কেন ?'

'ওটার ওপরেই আমার মামলা খাড়া করব, কাকা !...তুমি আমার সিনিয়ার...'

চারুপ্রসাদ কেমন থতমত খেয়ে বললেন, 'কী বলছিস ! আমি ও-রকম কোনো মামলা নেব না।'

'তবে তুমি ডিফেণ্ড করো। তোমার বংশকে। তোমাদের অতীতকে। আমায় একা লড়তে দাও।'

সাত

শমীক যাকে বলত মামলা-সাজানো—সেই কাজটা তাকে পেয়ে বসল। বাড়িতে চুনকাম, রঙচঙের কাজ শুরু হয়ে গেছে, মিস্ত্রী-মজুর খাটছে, নীচের তলার দালান আর বারান্দা জুড়ে কত কি ছড়ানো।

ঘরের কাজ শুরু হওয়া মানেই জিনিস-পত্র ওলট-পালট হওয়া। অর্ধেক জিনিস নষ্ট হবে, হারাবে। শমীক দেখল, তার যা প্রয়োজন, কিংবা যেসব জিনিসের প্রতি তার আগ্রহ সেগুলো নীচের ঘরে ফেলে রাখা মানেই নষ্ট হওয়া। খুঁজে খুঁজে সে অনেক কিছুই ওপরে এনে নিজের ঘরে রাখল।

করবী দাদার এই পাগলামি দেখে বলল, "তোর ঘরের যা চেহারা করছিস। আবার যখন এই ঘরে কাজ হবে, কী করবি ?"

করার কিছু নেই। শমীক নীচে থেকে গন্ধমাদন উঠিয়ে আনে নি। কিছু বাঁধানো কাগজ, বই, কয়েকটা পুরোনো ডায়রি ধরনের খাতা, চামড়ার একটা ছোট গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, এই ধরনের কিছু জিনিস। শমীকের ঘরে এগুলো রাখা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

শমীকের স্বভাব হল, কোনো কিছু নিয়ে মাতলে সহজে ছেড়ে দেয় না। এই জেদ তার বরাবরের। এখন যা নিয়ে সে মাতল তাকে অন্যে যে যাই বলুক, শমীক মনে করত ব্যাপারটা তার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় এই জন্যে যে, সে এর মধ্যে যেন রহস্যজনকভাবে কোথাও রয়েছে।

একদিন বসুধা এসেছিল। কথায় কথায় শমীক তাকে বোঝাতে চাইল, যে-কোনো মানুষের জীবনের দশ আনা শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোবৃত্তি তার পারিবারিক সূত্রে পাওয়া। কোনো লোকই স্বয়ম্ভু নয়, সে স্বতন্ত্র কিন্তু নিঃসম্পর্ক নয়। আমরা যা পাই, যেমন হয়ে উঠি তার প্রাথমিক গড়নটা আসে পরিবার থেকে। বাকিটা আমরা বাইরে থেকে গ্রহণ করি। কিন্তু বাইরে থেকে যা আসে তার মধ্যেও এমন কিছু থাকে না যা পারিবারিক নয়। অন্য অন্য মানুষের পারিবারিক শিক্ষার সমষ্টিগত চেহারাটাই লুকোনো থাকে তার মধ্যে। বিদ্যাসাগর বলো, আর ভূদেব মুখুজ্যেই বলো—তাঁরাও যে-যাঁর পরিবার থেকে উদ্ভূত। এই রকম নানা পরিবারের নানা শিক্ষাদীক্ষা, ধারণা, চেষ্টাই হল সামাজিক প্রভাব।

বসুধা বন্ধুর কথার কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। প্রশ্ন করল, তর্ক করল না। বলল, "সামাজিক প্রভাবটাকেও তুই পারিবারিক প্রভাব বলতে চাস ?"

শমীক বলল, "সমাজ হচ্ছে মৌমাছির চাকের মতন। অনেকগুলো খোপ মিলিয়ে একটা গোটা চাক। খোপগুলোকে তুই কি বাদ দিতে পারিস ?"

বসুধা বলল, "তা হয়ত পারা যায় না, কিন্তু সমাজের ইতিহাসটা এত জটিল যে তাকে শুধু পারিবারিক জীবনের সমষ্টিগত ইতিহাস বলে ভাবা হয়ত ভুল। যাক গে, তোর মাথায় এখন এইসব ভাবনা কেন?"

শমীক একটু চুপ করে থেকে বলল, "দেখ বসুধা, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যাদের কাছ থেকে এসেছি তারা আমাদের এই অবস্থার জন্যে দায়ী।"

"বুঝলাম না।"

"কেন বুঝলি না! এটা তো শক্ত কথা নয়। আমাদের জেনারেসন আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেচে এর দায়দায়িত্ব কার? আমাদের, না আমাদের পূর্বপুরুষের?"

বসুধা বলল, "তোর এ যুক্তি মানতে হলে বলতে হবে, আমাদের নিজের কোনো দায়িত্ব নেই। তুই কি মানুষকে প্রোডাক্ট হিসেবে ভাবিস?"

"না, তা ভাবতে চাইছি না; তবে কোনো মানুষই পুরোপুরি তার পারিবারিক ধ্যান-ধারণা, মনোবৃত্তি অ্যাটিচুড থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারে না। তার জীবনের অনেকখানি এর মধ্যে মিশে থাকে, এমনভাবে থাকে যে চট করে বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। খুঁজে দেখতে হয়।"

"তুই সেটা খুঁজে দেখছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কী হবে খুঁজে?"

"নিজেকে দেখতে পাব।"

"নিজেকে দেখার জন্যে নিজেই কি যথেষ্ট নয়?"

"না, কখনো নয়। আমি তা স্বীকার করি না।"

বসুধা আর তর্কের মধ্যে গেল না। শমীকদের পরিবার সে স্কুলবেলা থেকে দেখে আসছে। আজকালকার দিনে এ-রকম

পরিবার ক'টা দেখা যায়? আদপেই যায় কি না বলা মুশকিল এত বড় সংসার, যেখানে সবই ঘটতে পারত, স্বার্থ নিয়ে লোভ নিয়ে ক্ষুদ্রতা নিয়ে, সেখানে তো কিছুই ঘটল না। বসুধার নিজেদের পরিবারেও এমন ঘটে নি, তার বাবা মারা যাবার পর দুই মামা মিলে বাবার আর্ট প্রেস-এর বারো আনা টাকা লুটেপুটে নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, বাকিটা মা বাবারই এক কর্মচারীকে বেচে দিতে বাধ্য হল। নিজের ভাইদের, যারা প্রায় নিরাশ্রয় ছিল, লেখাপড়াও শেখে নি, তাদের এতখানি করার পরও যে অকৃতজ্ঞতা মা দেখল— তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভাইদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক মা আর রাখে নি। আলগা সামাজিক সম্বন্ধ ছাড়া ওদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই। সে তুলনায় শমীক শুধু ভাগ্যবান নয়, তাদের পরিবারকে আদর্শ বলা যায়।

শমীক তার যুক্তিকে যেভাবে খাড়া করছিল তার কতটা গ্রাহ্য আর আর কতটা গ্রাহ্য নয় সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। কিন্তু তার মাথায় নিজের যুক্তিটাই ভর করে থাকল; সে ক্রমশই তার মধ্যে ডুবে যেতে থাকল।

একদিন বেহালায় ললিতমোহনের কাছে গিয়ে কিছু সাধারণ কথাবার্তার পর শমীক আচমকা জিজ্ঞেস করল, "মামা, তুমি বাবার চেয়ে বছর চারেকের বড় না?"

মাথা নেড়ে ললিতমোহন বললেন, হ্যাঁ।

শমীক জিজ্ঞেস করল, "মার যখন বিয়ে হয় তখন তুমি ডাক্তারী পাস করেছ?"

"সেই বছরেই করেছি।"

"তোমার বাবা—মানে আমার দাদু করত স্বদেশী, সি আর দাশের চেলা ছিল, তুমিও কংগ্রেসী করে বেড়িয়েছ— ; আমায় একটা কথা বলো তো, বাবাদের পরিবারের সঙ্গে তোমাদের কেমন করে মিল হল?"

ললিতমোহন যেন ব্যাপারটা বুঝলেন না। বললেন, "কেন?"

"জিজ্ঞেস করছি। আমার মহামান্য ঠাকুরদা ঈশ্বরদাস করতেন
:দের ব্যবসা, ভদ্রলোক লাট-বেলাটের ধামা ধরে বেড়াতেন, পুলিশ
:মিশনারের বাড়িতে বড়দিনেব সময় যে ডালি পাঠানো হত তার
:বচ পড়ত শ' চারেক টাকা—তখনকার দিনেই।"

ললিতমোহন অবাক হয়ে বললেন, "এ-সব তুই কী করে
:ানলি?"

শমীক হেসে বলল, "জেনেছি। ঈশ্বরদাসেব ছেড়াখোঁড়া
:সেবের খাতা থেকে। ডায়রিতে লেখা আছে। তখন আমাব
:কুবদামশাই সাড়ে পাঁচশো টাকায় পুবোনো মিনার্ভা গাড়ি কিনে
:াউন্সিলাব বলরামবাবুকে উপহাব দিয়েছিলেন।"

ললিতমোহন কেমন ইতস্তত করে বললেন, "তখন ওই রকমই
: জার ছিল। কলকাতায় পাঁচ সিকে সের বড় রুইমাছ পাওয়া যেত।"

"মাছের বাজার যেমনই থাকুক, বিয়ের বাজারও কি এই রকম
ছল? ছেলের বাড়ি সাহেবদের ধামা ধবে আছে আর মেয়ের বাড়ি
:দেশীআনা করছে!"

ললিতমোহন বিপাকে পড়ে গেলেন। শমীকের প্রশ্নের অর্থটা
তনি বুঝতে পারছিলেন। সবাসরি কোনো জবাব না দিয়ে তিনি
:ললেন, "তখনকার দিনে ঘব বাড়ি বংশ রাঢ়ী বঙ্গজ এইসব নানা
:ক দেখে বিয়ে-থা দেওয়া হত। তোর ঠাকুরদারা সদ্বংশ। তাছাড়া
তার বাবা ছিল সুপাত্র।...আমার ঠিক মনে নেই ঘটকালিটা কে
:বেছিল, তবে তুই যে বলবামবাবুব কথা বললি—উনি মাঝখানে
:লেন।" বলে ললিতমোহন সামান্য চুপ করে থেকে তখনকার
:নের বিয়ে সংক্রান্ত প্রথাটা বোঝাতে লাগলেন।

শমীক তেমন কান করল না। বলল, "ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়,
:মা। আমি বলব কী হয়েছিল?"

ললিতমোহন যেন কৌতুক বোধ করলেন। চল্লিশ বছর আগে কী
:টেছে তার কথা বলবে শমীক? মার কাছে মামার বাড়ির গল্প?

শমীক বলল, "ঈশ্বরদাসরা সদ্বংশ না কি তা আমি জানি না, আমার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একটা লোক, ঈশ্বরদাসের বাবা পেটের ধান্দায় কলকাতায় এসেছিল। সোওয়া শ' বছর আগে কলকাতায় এসে কোর্ট কাছারিতে চাকরি পাওয়া খুব বোধ হয় কঠিন ছিল না। তখনকার লোকগুলো আর কিছু বুঝুক না বুঝুক মামলা-মোকদ্দমা বুঝত, ফলে এই লাইনটা ছিল পয়সা রোজগারের ভাল জায়গা। ঈশ্বরদাসের বাবা পেশকারী করে দু হাতে টাকা কামিয়েছে। লোকটা টাকা কামানোর ব্যাপারে ঘুঘু ছিল। নয়ত পেশকারীতে কি অত টাকা কামানো যায়।"

ললিতমোহন ঈশ্বরদাসের বাবার বিষয়ে তেমন কিছু জানতেন না। বললেন, "দেশে জমি-জায়গা ছিল।"

"ঘোড়ার ডিম ছিল," শমীক অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "কিছু ছিল না। জমি-জায়গা থাকলে কলকাতায় পেটের ধান্দায় আসত না।"

"তাতে আর দোষ কী হয়েছে? সকলেই তো ওইভাবে এসেছে।"

"আসুক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি যে বলছ ঠাকুরদার বংশ খুব একটা কেউকেটার বংশ ছিল তা নয়। সদ্বংশ না অসৎ বলা মুশকিল। একেবারে সাধারণ ছিল লোকটা। পয়সা রোজগার করে কলকাতায় ঘর-বাড়ি কেনে। ঠাকুরদার বাবা ছেলেকে বড় ঘরে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। পাবে নি তেমন। ঠাকুরদা নিজের ছেলের বিয়ের সময় সেটা পুষিয়ে নিয়েছে।"

ললিতমোহন চুপ করে থাকলেন। কথাটা মিথ্যে নয় পুরোপুরি। এই দুই বংশের প্রাচীন যোগাযোগটা দৃষ্টিকটু। ললিতমোহনের ঠাকুরদা প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুমা ছিলেন আরও বড় পরিবারের মেয়ে। ললিতমোহনের বাবা একসময়ে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে কাজও করেছিলেন। সবই ছেড়েছুড়ে শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধুর দলে ঢুকেছিলেন; স্বদেশী করেই

তাঁর দিন কেটেছে। ললিতমোহনদের বাল্য এবং যৌবনের দিন কেটেছে বাড়ির স্বদেশী আবহাওয়ায়, তখনকার দিনের উন্মাদনায়।

শমীক বলল, "মামা, তুমি মানো আর না-মানো আমি বলছি, ঈশ্বরদাস সমাজের চোখে মান্যগণ্য হবার জন্যে এবং বড় পরিবারে কাজ করার জন্যে তোমাদের বাড়ি থেকে মেয়ে নিয়েছিল।"

"কিন্তু তোর ঠাকুরদার সংগতি ছিল, নামডাকও ছিল।"

"উঁহু, তা নয়। পয়সা থাকলেই কি আর সম্ভ্রান্ত হয়। আমার ঠাকুরদার বাবুআনা ছিল, সেকালের কাপ্তেনী ছিল, কুসংসর্গ ছিল, সম্ভ্রম ছিল না। ঠাকুরদা সেটা করেছিল তোমার বাবার সম্ভ্রম দেখিয়ে।"

ললিতমোহন নীরব থাকলেন। তাঁর মনে পড়ল, ঈশ্বরদাসের চারিত্রিক দুর্নামের জন্যে বাবা নিজে এবং মা-মাসীরা এই বিয়েতে প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন। বিয়ের কথাটা পাকা হতেও বছর খানেক কেটে গিয়েছিল। বলরামবাবুই বাবাকে শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়েছিলেন। অবশ্য ছেলে হিসেবে দেবপ্রসাদকে কারও অপছন্দ হয় নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শমীক বলল, "একটা কথা তোমায় বলি, মামা। তোমরা বড় অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলে। একদিকে স্বদেশী আর কংগ্রেস করেছ, বোমা বেঁধেছ, চরকা কেটেছ, দলে দলে লেখাপড়া ছেড়েছ, জেলে গিয়েছ। আবার পূর্ণ বা আধা স্বরাজ তাই নিয়ে দলাদলিও করেছ। আর সেই তোমরাই আবার বৃটিশ সরকারের ধামা-ধরাদের সঙ্গে লেনদেন করে গেছ।"

ললিতমোহন আপত্তি জানিয়ে বললেন, "ফ্যামিলির ব্যাপারে কে স্বদেশী আর কে স্বদেশী নয় এ-কথাটা কি বড় করে দেখা চলে? তা দেখতে হলে সেকালে অর্ধেক বাঙালি বাড়ির ছেলেমেয়ের বিয়ে হত না, ভাইয়ে ভাইয়ে একসঙ্গে থাকাও চলত না। এক ভাই ডেপুটিগিরি করে, অন্য ভাই স্বদেশী করে, এমন আকছার হয়েছে।"

শমীক বলল, "তোমরা যা করেছ তা জাস্টিফাই করার চেষ্টা যে করবে এটা সোজা কথা। তোমরা বাল্যবিবাহে আপত্তি করেছ, আবার গৌরীদানও করেছ ; তোমরা ব্রাহ্ম, কৃশ্চান কত কী হয়েছ, অথচ বিয়ের সময় বামুন কায়েত দেখেছ ; তোমরা রায়ট লাগলে মুসলমানদের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়তে নেমেছ—আবার মুসলমানদেব ভোটের জন্যে বিলটিল্ পাস হবার সময় সদলবলে সবে থেকেছ···"

ললিতমোহন বললেন, "এ-কথা তোকে কে বলেছে ?"

"আমি দেখেছি। দেখতে চাও দেখাতে পারি।"

"তুই কি আমাদের নাড়িনক্ষত্র ঘাঁটতে বসেছিস ?"

"আমাদের মানে আমার পরিবারের তো বটেই।"

"তা বাবুর হঠাৎ এ শখ কেন ?" ললিতমোহন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন।

শমীক বলল, "বাঃ, একবার দেখতে ইচ্ছে করে না, কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

"পাচ্ছিস কিছু দেখতে ?"

"পাচ্ছি বইকি ! যেমন দেখতে পাচ্ছি, আমার মহামান্য ঠাকুরদা কাউন্সিলার বলরামবাবুকে নানা রকম ভেট দিত, গাড়ি কিনে দিয়েছিল, তার বদলে বেনামী একটা ব্যবসা চালাত, কর্পোরেশানের হুকুমে যত ঘরবাড়ি ভাঙা হত তার দু-দশটা ঠাকুরদার কাছে আসত। টাকা রোজগারের ওই একটা বড় রাস্তা ছিল ভদ্রলোকের। নিজের বাড়িতে ওই করে কত বাহারই না ফলিয়েছে।—তাছাড়া, মামা তুমি যতই বলো, আমি জানি বলরামবাবু তোমার বাবাকে হাত করেছিল, নয়ত এই বিয়েটা হত না।"

"এটাও তুই জানিস ?"

"জানি। বলরামবাবুর একটা চিঠি আমি দেখেছি। কোস্ট লাইন জাহাজে সিলোন বেড়াতে গিয়ে ভদ্রলোক তাঁর বন্ধু ঈশ্বর-

দাসকে লিখেছিলেন। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, দাদুকে বিয়ের ব্যাপারে তিনি রাজী করিয়ে এনেছেন—"

ললিতমোহন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

শমীক কোনো রকম দ্বিধা না করেই বলল, "অবশ্য এখানেও একটা ভেট দিতে হয়েছিল তোমার বাবাকে।"

"ভেট?"

"হ্যাঁ, ঈশ্বরদাসকে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ডোনেসান দিতে হয়েছিল। তোমার বাবা আবার ন্যাশনাল কলেজের বডির মধ্যে ছিল। বলবে, ওটা ডোনেসান ফর গুড কজ। বাট ফর পারসোনাল বেনিফিট।"

ললিতমোহন কেমন হতভম্ব হয়ে ভাগ্নের মুখ দেখছিলেন। এ-সব কথা তাঁর এখন মনেও পড়ে না। এর কোনো গুরুত্ব আছে বলেও তার কোনো দিন মনে হয় নি।

শমীক বলল, "কিছু মনে কোরো না মামা, তোমাদের আদর্শ, স্বদেশসেবা, রাজনীতি করা, দুঃখ সওয়া, জেল খাটার পাশে পাশে এই ধরনের একটা ব্যাপার বরাবর চলেছে। তোমরা স্বদেশীআনার সঙ্গে বিদেশীআনার একটা মিল রাখতে চেয়েছ। নিজেদের স্বার্থ বুঝে।"

"স্বার্থ বুঝে?" ললিতমোহন যেন দুঃখ পেলেন।

শমীক বলল, "তোমরা একে স্বার্থ বলবে না। কী বলবে তাও আমি জানতে চাই না। আমি তো দেখছি, একদিকে তোমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে লড়েছ, অন্যদিকে সাহেবি-ধামার সুযোগটুকু নিয়েছ।

ললিতমোহন স্বীকার করলেন না। বললেন, "আমাদের দোষ খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। দোষটাই সব নয়।"

"দোষটা সব না হলেও অনেক।" বলে শমীক হঠাৎ মামার দিকে সরাসরি চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি এককালে শুনেছি পরম কংগ্রেসী ছিলে, এখন আর ও পথ মাড়াও না কেন? বিয়াল্লিশ

সালে যে-লোক জেল খেটেছে সেই লোক কেন আর ওসব কথা মুখেও আনে না? আমার জ্ঞান হবার পর থেকে আমি দেখে আসছি—তুমি খদ্দরের কোর্তা পরা ছাড়া কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখ নি। কেন?"

ললিতমোহন অনেকক্ষণ কোনো জবাব দিলেন না কথার। শীতেব বোদ তাঁর পিঠে, সাদা মাথা, গায়ের শাল গড়িয়ে নীচে লোটাচ্ছিল। একটা ঘুঘু এই সকালে কোথাও ডাকছিল। কোনো লোহা-পেটা কারখানার শব্দ ভেসে আসছিল অনেক দূর থেকে।

শেষে ললিতমোহন বললেন, "আমরা পুরোনো লোকবা 'ডিসর্হা-টেন্‌ড্‌ হয়ে গেলাম। গান্ধীজীকে যেদিন গুলি করে মারা হল সে-দিনই বুঝেছিলাম—এ-দেশেব সমস্যা আবও জটিল হয়ে গেল। এ পাপ যে কী! এটা তুই বুঝবি না। ইউ ডু নট নো হোয়াট ওআজ গান্ধী! সে-যুগে যে জন্মায় নি—তার পক্ষে ওটা বোঝা সম্ভব নয়...।"

শমীক বাধা দিয়ে বলল, "কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে তোমার আর ভাল লাগে নি। আশাভঙ্গ হয়েছিল।"

"হ্যাঁ।"

"মানে, তোমরা দেখেছিলে বরাবর যা ভেবে এসেছ, আশা করেছ যে আদর্শ ধরে রেখেছিলে—তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"তা ছাড়া আর কি!"

"তা হলে তুমি স্বীকার করো, তোমাদের সবাই একরকম ছিল না। যারা অন্যরকম ছিল তারাই মাথায় চড়ল, আর তোমরা সরে এলে।"

ললিতমোহন মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, তাঁরা সরে এলেন।

ললিতমোহনের কাছ থেকে ফিরে এসে শমীক চারুপ্রসাদকে বলল, "কাকা, মামা তোমায় একবার যেতে বলেছে।"

"তুই বেহালায় গিয়েছিলি ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন আছে ললিতদা ?"

"ভালই।"

চারুপ্রসাদ কেমন সন্দেহ করে বললেন, "তুই ওদিকে গিয়েছিলি হঠাৎ ?"

শমীক বলল, "দরকার ছিল।" বলে দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে হেসে বলল, "আমার মামলা কিন্তু বেশ জোরালো হয়ে যাচ্ছে, কাকা। তুমি প্যাঁচে পড়ে যাবে।"

চারুপ্রসাদ ভাইপোকে দেখতে দেখতে বললেন, "তুই তো আমাদের প্যাঁচেই ফেলেছিস !"

আশালতা ছেলের ব্যাপারে কেমন ধৈর্যহীন হয়ে উঠেছিলেন। শমীকের বাড়াবাড়িটা আর তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি অন্ধ নন, বোকাহাবাও নন। একসময়ে ছেলের খেপামির জন্যে আশালতার দুশ্চিন্তা হত, কিন্তু সে দুশ্চিন্তা তাঁকে এমন কষ্ট দিত না ! শমীকের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে যে উদ্বেগ তাঁর দেখা দিয়েছিল—তাও তাঁকে এতটা উৎকণ্ঠায় ফেলে নি। কিন্তু এখন তিনি সমানে দুঃখ, উৎকণ্ঠা, বিরক্তি এবং গভীর অতৃপ্তি বোধ করছিলেন।

স্বামীকে অনেকবার একই কথা বলে বলে তিনি ক্লান্ত। দেওরকে কতবার বলেছেন, 'ছেলেটার মাথা বিগড়ে যাচ্ছে ঠাকুরপো, ওকে আর আশকারা দিও না, কিছু একটা করো।' দুঃখ করে জা ইন্দুলেখাকে বলেছেন, 'ও আমাদের এমনি করেই জ্বালাবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।'

শচী এ-বাড়িতে এসেছিল অমৃতের বিয়ের তত্ত্ব-তাবাসের ফিরিস্তি করতে। পুরবীর আসার কথা ছিল—শাশুড়ির শরীর খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ, আসতে পারে নি। পুরবী কমই বাপের-বাড়ি আসে। সারাটা দুপুর বাড়ির মেয়েরা মিলে এই সব

তত্ত্ব-তাবাসের ফিরিস্তি শেষ করে যখন উঠল তখন শীতের বেলা পড়ে যাচ্ছে।

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে শচী ফিরবে। তার স্বামী জগৎ এসে নিয়ে যাবে কথা আছে।

সন্ধ্যে বেলায় গা ধুয়ে কাপড় বদলে শচী বাবার সঙ্গে গল্প করছিল, কথায় কথায় শমাকের কথা উঠল।

আশালতা সামনেই ছিলেন, বললেন, "এ-রকম একগুঁয়ে আমি আর দেখি নি। এ বাড়িতে ও একটা জাত-ছাড়া ছেলে জন্মেছে।"

শচী ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু কিছু কথা শুনেছে। আজকাল এ বাড়িতে এলেই তার কথা কানে যায়।

শচী বলল, "সারা দিনে একবার শুধু ওর মুখ দেখলাম। ও কোথায় ?"

"কোথায় আবার, নিজের ঘরে।"

"বাড়িতেই রয়েছে ! একবারও গলা শুনলাম না ?"

"না," আশালতা মাথা নাড়লেন, "ঘরের মধ্যে ভূতের মতন বসে থাকে সারাদিন। বসে বসে বই ঘাঁটে, আর কী যেন লেখে।"

"লেখে ? কী লেখে ?"

"জানি না। কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বলল : তাকেও দেখতে দেয় না।"

দেবপ্রসাদ এতোক্ষণ স্ত্রী ও মেয়ের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, "আজকালকার ছেলেদের মতন হয়ে যাচ্ছে, অ্যারোগ্যান্ট ইররেসপনসেবল, অ্যাংগ্রি···। আমাদের বাড়ির ছেলে এমন হতে পারে আমি ভাবি নি।"

শচী জিজ্ঞেস করল, "এ-রকম কেন হয়ে যাচ্ছে ?"

"কে জানে," দেবপ্রসাদ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "বোধ হয় মনে করেছে, মা-বাপ কাকা-কাকি সকলকে দুঃখ দিলে, অপমান

করলে বড় কিছু করা হয়। ও আজকাল আমাদের মান্য করা দূরে থাক, অবজ্ঞা করে।"

শচী বাবার কথার মধ্যে গভীর দুঃখ ও হতাশা অনুভব করল। তারপর বসে থাকতে থাকতে বলল, "যাই একবার দেখে আসি।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে আশালতাকে ডাকল।

আশালতা বললেন, "তুই যা।"

শচী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকলেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আশালতা বললেন, "যাই বলো বাপু, তোমাদের বংশে একটা দোষ আছে। তোমরা বড় নিষ্ঠুর।"

দেবপ্রসাদ অন্যমনস্ক ছিলেন, স্ত্রীর কথা কানে যাবার পর তাকালেন। "নিষ্ঠুর?"

আশালতা জবাব দিলেন না। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বড় বড় দরজার একটা পাল্লা বন্ধ, শীতের কনকনে ঠাণ্ডা আসছে তবু, ঘরের বাতিটা উজ্জ্বল হলেও এত বড় ঘরে তার আভা ম্লান হয়ে আছে।

দেবপ্রসাদ যেন অপছন্দের গলায় আবার বললেন, "নিষ্ঠুর? আমরা নিষ্ঠুর?"

আশালতা তাঁর বিষণ্ণ চোখ তুলে কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন, "তা ছাড়া আর কী বলব!...শ্বশুরমশাই কি কোনো দিন তোমার মার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন?"

দেবপ্রসাদ ভাবতে পারেন নি আশালতা হঠাৎ এ-রকম জবাব দেবেন। প্রথমটায় তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তারপর নিজেই বুঝতে পারলেন না কেন, একবার দেওয়ালের দিকে তাকালেন। হয়ত মা নীরবালার ছবিটা খুঁজলেন। নেই। বহুকাল ধরেই নেই। দেবপ্রসাদের বাল্য ও কৈশোরকালে ছিল, তারপর নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কে কোথায় ফেলে দিয়েছিল। অবশ্য ছবিটা বাবার ঘরে

থাকত, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের পরও। শেষে আর কোথাও থাকল না।

অতি দূরান্তের এই স্মৃতি, যা একেবারেই অস্পষ্ট, দেবপ্রসাদকে কেমন দুঃখিত করল। অথচ তিনি স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ কেমন অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তুমিও কি আজকাল তোমার ছেলের দলে ভিড়েছ? এ-সব কথা আর বলবে না আমার কাছে।"

শমীক বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, "তুমি আসছ কবে?"

শচী দাঁড়িয়ে ছিল, বিছানার কাছেই। তার চেহারা ভারী হয়ে পড়েছে। হবারই কথা। বছর সাঁইত্রিশ বয়েস হয়ে গেল, তিন ছেলেমেয়ের মা, বড় মেয়ে সোনার বয়েসই ষোলো। তবু শচীকে এখনও সুন্দর দেখায়। শরীর ভারী হওয়ায় গড়ন খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে, তা বলে কি সবই গেছে।

"মাঘ মাসের বাইশ তারিখে বিয়ে। আমি আসব ধর আঠারো উনিশ তারিখে।"

"তুমিই তো এখন নাম্বার টু···।"

"মানে?"

"বাবা হল বিয়ের কর্তা, নাম্বার ওয়ান; তার পরেই দেখছি তোমার পজিসন। সব ব্যাপারেই দেখি সকলেই বলে—শচীকে জিজ্ঞেস করো, শচীকে খবর দাও..." শমীক হাসল জোরে জোরে, "তোমার পোর্টফোলিওটা খুব ইনপর্টেন্ট।"

শচী ভাইয়ের বিছানার পাশে বসল। হেসে বলল, "তোর বিয়ের সময় আরও কর্তামি করব।"

"কেন, নিজের ভাই বলে?" শমীক ঝট্ করে বলল।

শচীর হাসিমুখ সঙ্গে সঙ্গে যেন নিবে আসার মতন হল। অপ্রতিভ হয়ে পড়ে শচী বলল, "ছি। ছি ছি! তুই এ-রকম কথা আর কখনো বলবি না।"

শমীক তার মোটা পুলওভারের লম্বা কলার কানের দিকে উঠিয়ে দিতে দিতে বলল, "আমার মনেহল, তুমি একটা তফাত দেখছ, তাই বললাম। যাক গে, আমার বিয়েতে কাউকে কর্তামি করতে হচ্ছে না।"

শচীও প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি পালটে ফেলতে চাইছিল। বলল, "সে পরে দেখা যাবে। আমি যা জিজ্ঞেস করলুম তার জবাব তো দিলি না?"

শমীক বলল, "তুমি কেমন ধরনের জবাব চাও আগে বলো।"

অবাক হয়ে শচী বলল, "কেমন ধরনের জবাব আবার! তোর জবাব তুই জানিস।"

শমীক যেন বিছানায় শুয়ে খেলা করছে, পা দুটো দু পাশে ছড়িয়ে দিল, হাত মাথার দিকে তুলল। বলল, "আমার নিজের জবাব হচ্ছে, আমি একটা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।"

"ঠাট্টা-ইয়ার্কি রাখ শমী।"

"ঠাট্টা নয়, সিরিআসলি বলছি।"

"তুই নাকি খাতায় কী সব লিখিস?"

"লিখি।"

"কী লিখিস?"

"গবেষণালব্ধ ব্যাপার-স্যাপার।"

শচী এবার রাগ করে বলল, "দেখ শমী, ফাজলামি করিস না। আমি তোর দিদি, দশ বছরের বড়, তোর কাঁথা বদলে দিয়েছি কত…।"

শমীক হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "বেশ বলেছ।"

"হ্যাঁ, বলেছি। কই, তুই কী লিখিস দেখা তো।"

"ওটা দেখানো যাবে না।"

"কেন?"

"সিক্রেট ব্যাপার। আমার মামলার পয়েণ্টস নোট করা আছে—।"

শচীর ভাল লাগছিল না। বলল, "তুই দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছিস। এ বাড়িতে পা দিলেই তোর নামে শুনতে হয়। তুই কাউকে গ্রাহ্য করিস না, মানিস না, সবাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিস!"

শমীক পা দুটো জোড়া করে নিল। বলল, "ব্যাপারটা তা নয়।"

"তা নয় তো কী?"

"আমি আমার মতন থাকি, আমার মতন কথা বলি। বাড়ির লোকের এটা পছন্দ হয় না।"

"না হলে করিস কেন?"

"বাঃ, আমি কি গাধা না ঘোড়া, না চেয়ার-টেবিল যে অন্যের পছন্দ মতন থাকতে হবে।"

শচীর রাগ হচ্ছিল। কেমন কথা বলে, দেখেছ? শচী বলল, "দেখ শমী, তুই আর কচি খোকা নোস; তোর যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে। কোন্‌টা ভাল, কোনটা মন্দ তুই বুঝতে পারিস। এতটা বয়েস হল, এখনও বাড়িতে বসে বসে কুঁড়েমি করে দিন কাটাবি এ কেমন কথা! কিছু তো একটা করবি, নয়ত বাঁচবি কী করে, ভালই বা লাগবে কেন? বসে থাকতে থাকতে মাথায় আর পদার্থ থাকবে না, কোনো দিনই তোর কিছু করতে ইচ্ছে হবে না তখন।

শমীক উঠে বসে বলল, "দিদি, তুমি একটা দামী কথা বলেছ। ভেবে দেখ, আমার বাপকাকার পয়সা আছে, বাড়ি আছে বিরাট, খাওয়াপরা থাকার কোনো কষ্ট আমার নেই। তবু এভাবে বসে থাকলে আমার আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। তাই না বললে? তা হলে ভেবে দেখ, আমার মতন হাজার হাজার ছেলে, লক্ষ লক্ষ ছেলে—যাদের খাবার পরবার মাথা গোঁজবার জায়গাটাও ঠিক মতন নেই—তাদের কী অবস্থা। লক্ষ লক্ষ ছেলের মাথার তা হলে কী অবস্থা হচ্ছে ভেবে দেখ। সব পদার্থ একেবারে অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

শচী এমন এক অদ্ভুত কথা শুনবে স্বপ্নেও ভাবে নি। কী কথার কী জবাব? ভুরু কুঁচকে শচী বললে, "লক্ষ লক্ষ ছেলের সঙ্গে তোর কী? আমি তোর কথা বলছি। তুই নিজের চরকায় তেল দে।"

শমীক বেঁকা করে হেসে বলল, "তোমাদের এই বাড়িতে এই শিক্ষাটাই দেওয়া হয়েছে, নিজের চরকায় তেল দেওয়া।—বেশ তো, ধরে নাও আমি তাই দিচ্ছি।"

শচী অবাক হয়ে ভাইয়ের মুখ দেখতে লাগল।

আট

মৃদুলার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পরে। ফোনে মাঝেসাঝে কথাবার্তা হলেও দুজনে দেখা হচ্ছিল না; শমীক আসব-আসব করেও আসছিল না। এক রবিবার সকালে শমীক নাকতলায় এসে মৃদুলাকে অবাক করে দিল। বলল, "মৃদু, আজ তোর জন্যে সান্‌ডে টিকিট কেটেছি, হোল্‌ ডে তোর।"

মৃদুলার যত রাগ হয়েছিল তারও বেশী হয়েছিল অভিমান। আজ কতদিন ধরে শমীক যাব-যাচ্ছি করে তাকে ধাপ্পা মেরে যাচ্ছে, কী দরকার ছিল তার ধাপ্পা মারার। অন্তত তিন-চার দিন মৃদুলা অফিস থেকে ফেরার পথে নানা জায়গায় অপেক্ষা করেছে শমীকের জন্যে। তার মধ্যে দু-দুটো শনিবার তো গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা ধরে গেছে, চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। আর যত রাজ্যের বাজে লোক তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আজেবাজে কথা বলে গেছে।

মৃদুলা অভিমান করে বলল, "আমার কী ভাগ্য আমার জন্যে হোল ডে; কোনো দরকার নেই আমার। অনেক দূর থেকে এসেছিস, চা-মিষ্টি খা, মা-বাবার সঙ্গে গল্প করে বাড়ি যা। আমি এখুনি বেরিয়ে যাব আমার এক বন্ধুর বাড়ি।"

শমীক হো হো করে হেসে উঠে মৃদুলার পিঠের বিনুনি গলার

কাছে জড়িয়ে দিয়ে বলল, "দুর, তোর আবার বন্ধু কোথায়, আমিই তোর ওনলি ফ্রেণ্ড। এ-রকম বন্ধু আর পাবি না।"

"কেন? তুই কিসের ধ্বজা ধরে বসে আছিস যে ওনলি ফ্রেণ্ড হবি?"

শমীক বলল, "আমি যে কী ধ্বজা ধরে আছি জানতে পারবি। নে, আর রাধা-বাধা ভাব করিস না ভাই।"

"উ, কী আমার কেষ্ট রে।" জিব ভেঙচে মৃদুলা বলল।

শমীক হাসতে হাসতে পালটা জবাবে বলল, "কেষ্ট বলিস না—কৃষ্ণ বল। কেষ্ট বললে চাকর-চাকর শোনায়, কৃষ্ণ একটা আলাদা ব্যাপার, তার অ্যারিস্টোক্রেসি আছে।"

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

শমীক মিথ্যে বলে নি। সকাল থেকেই নাকতলায় মৃদুলাদের বাড়িতে থেকে গেল। এই পরিবার তার অপরিচিত নয়, বাল্যকাল থেকেই সকলকে দেখে আসছে. পুরোনো প্রতিবেশী হিসেবে এক ধরনের আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছিল, মৃদুলার বাবা হেমন্তবাবু তো চারুপ্রসাদের বন্ধুই ছিলেন। দুই বাড়ির মধ্যে যে-রকম মেলামেশা ছিল তাতে শমীকের এবং মৃদুলার, অন্যান্য ভাইবোনেরও দিনের অনেক সময় পরস্পরের বাড়িতে যে কেটেছে তাতে সন্দেহ নেই। শমীক এটাও জানে, হেমন্ত মেসোমশাই যখন পারিবারিক অশান্তির মধ্যে পড়েছিলেন তখন বাবা প্রথমে সেই অশান্তি মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করেও যখন পারল না, তখন বন্ধুকে পরামর্শ দিল: 'অশান্তি কোরো না। তার চেয়ে তুমি ওই নাকতলার জমিটা কিনে ফেল। মাথা গোঁজার একটা জায়গা তুমি করতে পারবে। শান্তিতে থাকবে।'

মৃদুলাদের বাড়িতে শমীকের কোনো সঙ্কোচের কারণ ছিল না। বাড়ির ছেলের মতনই সে। অনেক দিন পরে এসেছে বলে, মাসিমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব হইহই করল, বাড়ির কথা বলল, দাদার

বিয়ের জন্যে বাড়িতে কেমন হই-হট্টগোল পড়ে গেছে—সে-গল্পও করল। আবার মাসিমাকে যথারীতি খানিকটা খেপাল। মাসিমা—মানে সুষমা বাঁ কানে বেশ কম শোনেন, তাই নিয়ে সকলেই রগড় করে, শমীকও খানিকটা রগড় করল।

সুষমা বললেন, "হ্যাঁ রে শমা, তুই তো সেই রকমই আছিস; তবে যে খুকি বলে তোর নাকি স্বভাব পালটে গেছে; কেমন হয়ে গিয়েছিস।"

"আমার বদনাম করে মাসিমা, মিথ্যে কথা বলে। মৃদু আমার পজিসন নষ্ট করতে চাইছে। ওকে বিশ্বাস করবেন না।" বলে শমীক আড় চোখে মৃদুলাকে দেখে।

সুষমা বলেন, "তোর শরীরটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে।"

"ও কিছু না, আমার ভেতরে কোথাও ক্যানসার হয়েছে।"

"ক্যানসার?'

"বোধ হয়। আজকাল ক্যানসারটা কলেরা-বসন্তর মতন হচ্ছে। আমাদের বুক পেট চিরলে হয়ত দেখা যাবে সবাই ইয়া ইয়া ঘা করে বসে আছি। মরব যখন পটাপট মরে যাব।"

সুষমা ধমক দিয়ে বললেন, "যাঃ, যত অলুক্ষনে কথা।"

মৃদুলা বলল, "ক্যানসার তো হয় নি, হয়েছে মাথার গোলমাল। অত পাকা ঘিলু কি আর ঠিক থাকে, জমে ইট হয়ে গেছে।"

খানিকটা হাসাহাসি হল।

শমীক সুষমার কাছ থেকে উঠে হেমন্তবাবুর কাছে গেল। হেমন্তবাবু নতুন বাড়ি করার পর ওই নিয়েই আছেন। হয় বাড়ির খুঁটিনাটি দেখছেন, দরজা জানলার নতুন ছিটকিনি নাড়ানাড়ি করছেন, একটু-আধটু নারকোল তেল দিয়ে দিচ্ছেন, কব্জাগুলোকে নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ করছেন, ঘরের কোথাও একটু ঝুল ময়লা দেখলে পরিষ্কার করছেন, আর না-হয় বাড়ির সদরের লাগোয়া হাত কয়েক জমিতে যে ছোট ফুলবাগান করছেন তাই নিয়ে ব্যস্ত। শীতের সামান্য কিছু মরসুমী ফুল এই বাগানে ফুটছে।

হেমন্তবাবু শমীককে নিয়ে বাড়ির ভালমন্দ যা-কিছু আছে দেখালেন। আগেই শমীক এ-বাড়ি দেখেছে, তবু একেবারে পুরোপুরি শেষ হওয়া বাড়ি দেখে নি। ছেলেমানুষের মতন হেমন্তবাবুর এই নতুন খেলনা নিয়ে মেতে থাকা শমীক কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করে গেল।

তারপর বসার ঘরের দিকে যেতে যেতে শমীক বলল, "মেসোমশাই, আপনার সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে।"

হেমন্তবাবু বললেন, "চলো; বসি। কিসের কথা তোমার?"

"বলব, চলুন বসি।"

বসার ঘরে এসে হেমন্তবাবু বসলেন। শমীক দরজার দিকে বসল। সুষমা রান্নাঘরে। মৃদুলা ছুটির দিনে মাকে সাহায্য করছে. তা ছাড়া কাচাকাচি, ঘরদোর পরিষ্কারের নানা কাজ।

শমীক অল্প সময় চুপ করে থেকে বলল, "মেসোমশাই, আপনি তো আমাদের ফ্যামিলিকে অনেক বছর ধরে দেখছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর।"

হেমন্তবাবু কেমন অবাক হলেন। বললেন, "হ্যাঁ, দেখছি বইকি। চারুদা যখন মেট্রপলিটানে হায়ার ক্লাসে পড়ছে, নাইনটিন টুয়েন্টি এইট-টেইট হবে, তখন আমি চারুদার এক ক্লাস নীচুতে এসে ঢুকলাম। আমার বাবাকে প্রথমে জেলা স্কুল থেকে ট্রান্সফার করে, তারপর সাসপেণ্ড করে দেয়। বাবা চাকরি ছেড়ে দেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে অত্যাচারটা তখন করত! বাবার স্কুলে কংগ্রেস ফ্লাগ ওড়ানো হয়েছিল বলে এই পানিশমেণ্ট।"

শমীক বলল, "তা হলে প্রায় পঞ্চাশ বছর আপনি আমাদের চেনেন?"

"চিনি বইকি বাবা!"

"আপনারা প্রথমে ও-পাড়ায় ভাড়াটে ছিলেন শুনেছি..."

"হ্যাঁ, এগারো নম্বর বাড়িতে ভাড়াটে ছিলাম। অনেক কাল ভাড়াটে ছিলাম। আমার বাবা কোনো কাজকর্ম না পেয়ে শেষে

রায়বাবুদের চিৎপুরের এস্টেট বাড়িতে কাজ নেন। চিঠিপত্র লেখালিখি করতেন। ছোটবাবুর বাবাকে মনে ধরে যায়—তিনি বাবাকে নিজের ছেলেকে পড়াবার ভার দেন। ওই সময়ে বাবা যা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন আর ছোটবাবুর সাহায্য নিয়ে বাবা আমাদের সাতাশ নম্বর বাড়িটা কেনেন।"

শমীক এ-সব কথা আগে কিছু কিছু শুনেছে। হেমন্ত মেসোমশাইয়ের বাড়ির কথা শোনার আগ্রহ তার ছিল না। কিন্তু বুড়ো মানুষ, পুরোনো কথা উঠলে খানিকটা এলোমেলো কথা বলবেন, এটা স্বাভাবিক। শমীক কথাটা ঘুরিয়ে নিল। বলল, "আপনি আমার ঠাকুরদাকে দেখেছেন তো?"

"তা আবার দেখি নি," হেমন্তবাবু বললেন, "ডাকসাইটে মানুষ। আমরা ওঁকে খুব ভয় পেতুম। বাঘের মতন মনে হত। রাশভারী ছিলেন। কত কী দেখেছি, বাবা; সে-সব তোমরা দেখ নি। ঈশ্বর-জ্যেঠা সকালে বাজার করতে যেতেন নিজে, গায়ে বাবু-ফতুয়া, হাতে ছড়ি, বুকপকেটে মানিব্যাগ, পেছনে বাড়ির চাকর। রিকশায় করে যেতেন। ফেরার সময় উনি ফিরতেন রিকশায় আর চাকর বাজারের ঝাঁকামুটের মাথায় বাজার চাপিয়ে ফিরত।" হেমন্তবাবু যেন পুরোনো স্মৃতির কোনো মোহে জড়িয়ে পড়ছিলেন। একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "ওই মানুষকেই দেখতাম ঠিক বেলা দশটা সোয়া দশটা নাগাদ গলাবন্ধ চীনে কোট, কোঁচানো ধুতি পরে, ছড়ি হাতে রিকশায় চেপে দোকানে বেরিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার ছোটবড় সবাই নমস্কার করত। উনিও নমস্কার জানাতেন।"

শমীক হঠাৎ বলল, "বিকেলে আর ঠাকুরদাকে ফিরতে দেখতেন না?"

হেমন্তবাবু কথাটা ধরতে পারেন নি। তাকিয়ে থাকলেন।

শমীক আবার বলল, "বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলায় তাঁকে আর রিকশা করে ফিরতে দেখতেন না?"

হেমন্তবাবু যেন সামান্য সচেতন হলেন। সামান্য থতমত খেয়ে বললেন, "না, বিকেলে আমরা খেলাধুলো করে বেড়াতাম, সন্ধ্যেবেলায় যে যার বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে লেখাপড়া করতে বসতুম। তখন আর কে গলির মধ্যে থাকবে?"

শমীক মনে মনে হাসল। মেসোমশাই কোন্ জায়গাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন—সে বেশ বুঝতে পারছিল।

"মেসোমশাই, আমি আপনার কাছে ক'টা কথা জানতে এসেছি। আমি ছেলেমানুষ নই। আপনি আমার কাছে লজ্জা পাবেন না। সংসারে ভালমন্দ আমি বুঝি। আমায় আপনি যা বলবেন আমি বিশ্বাস করে নেব। আমার কিছু জানার আছে।"

হেমন্তবাবু যেন বিব্রত বোধ করে তাকালেন শমীকের দিকে।

শমীক দরজার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় কী যেন জিজ্ঞেস করল।

হেমন্তবাবু যেন চমকে উঠলেন। তারপর স্তম্ভিত দৃষ্টিতে শমীককে দেখতে লাগলেন।

দুপুর বেলায় শমীক মৃদুলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মৃদুলা ট্যাক্সি ধরতে চেয়েছিল। শমীক বারণ করল। বলল, "অপব্যয় করিস না মৃদু, পয়সার মূল্য বুঝতে শেখ, নয়ত বিয়ের পর বরকে ফেল করিয়ে দিবি।"

মৃদুলা না হেসে-পারল না। কে কাকে অপব্যয় শেখাবে সেটা না বললেও চলে। আসলে শমীক আজ মেজাজে রয়েছে; তার যখন যা ভাল লাগবে তাই করবে।

রিকশা নিয়ে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এল ওরা। ডিপো থেকে এসপ্লানেডের ট্রামে উঠল।

"আমি ভাবছিলাম সিনেমায় যাবি," মৃদুলা বলল।

"সিনেমায় যাব কেন, এমন মার্ভেলাস রোদ, শীত, সিনেমায় গিয়ে বসে থাকব কোন দুঃখে, বরং সেরেফ রাস্তায় হেঁটে বেড়াব।"

মৃদুলার আর তাতে আপত্তি কী! এমন সঙ্গ সে না চাইবে কেন! সত্যিই আজ শমীক সারাটা দিন মৃদুলাকে ধরে দিচ্ছে। এ একেবারে আশাতীত ব্যাপার। কতদিন পরে এমন একটা কাণ্ড ঘটছে।

খানিকটা অবাকও হচ্ছিল মৃদুলা। শমীককে আজ যেমন ঝরঝরে, মেজাজী, হাসিখুশী লাগছে—এমন বেশ কিছুকাল লাগে নি। এই শমীক পুরোনো, সে এই রকমই! কিন্তু মধ্যে এমন ছিল না।

ট্রামে যেতে যেতে আর-একবার মৃদুলা বলল, "শমী, তোর মাথার গোলমালটা কেটে গেছে নাকি রে?"

"তুই-ই ভেবে নে।"

"দেখে মনে হচ্ছে, মেঘ যেন কেটে যাচ্ছে।"

"তা হলে কেটেই যাচ্ছে···।"

রাস্তার দিকে তাকিয়ে লোকজন দেখতে দেখতে মৃদুলা একসময়ে বলল, "তোকে ঠিক বোঝা যায় না, তুই একটা মিস্ট্রি।···বাবার সঙ্গে অত কিসের গল্প করছিলি রে?"

"মিস্টিরিয়াস ব্যাপার করছিলাম," শমীক হেসে বলল।

গড়ের মাঠের কাছাকাছি এসে শমীক মৃদুলাকে নিয়ে নেমে পড়ল। শীতের জ্বলজ্বলে দুপুর এখন থিতিয়ে এসেছে। রোদের যা-কিছু উত্তাপ আর গাঢ়তা যেন তলিয়ে জমে আছে মাঠে আর ঘাসে। মাথার ওপর শূন্য দিয়ে শুধু ফিকে ভাবটা ভেসে চলেছে রোদের। মাঠের চারপাশে লোক। পঞ্চাশ একশো গজ দূরে দূরে ক্রিকেট খেলার দল, বড়-ছোট সব: কোথায় যেন স্পোর্টস হচ্ছে কোনো ক্লাবের. একরাশ লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে; অজস্র লোক ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে শুধু শীতের রোদ খেতে বেরিয়ে পড়েছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে. বসছে, বাচ্চাকাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করছে। ঘুগনিঅলা, মুড়ি-বাদামঅলার অভাব নেই। মেদবহুল মাড়োয়ারী বউ-মেয়েরা গাড়ির পাশে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে আছে। নড়াচড়া করতে পারে

না বলেই। ম্যাজিকঅলা লোক জমাচ্ছে এক দিকে, অন্য দিকে ছুটো ভেড়া নিয়ে দু দলে বাজি লড়ছে!

শমীক হাঁটতে হাঁটতে বলল, "মাঠ ক্রস করে সোজা রেড রোডে গিয়ে পড়ব—ওখান থেকে শর্টকাট করে মোহনবাগানের মাঠের দিকে যাব, তারপর গঙ্গা। অনেকটা হাঁটতে হবে, পারবি ?"

"সোজা এসপ্লানেডে গিয়ে নামলেই পারতিস।"

"আরও সহজ হত যদি টালিগঞ্জ থেকে ট্যাক্সি করে সোজা আউটরামে চলে যেতাম! সত্যি মৃদু, ইয়ের বছরটা যা বাড়াচ্ছিস, দু পা হাঁটার নাম শুনলেই আঁতকে উঠিস। কী হবে তোদের। দেশের তোরা সর্বনাশ করে ফেললি। জানিস দি গ্রেট পি সি রায় পঞ্চাশ বছর আগেই বলেছেন, বাঙালীরা দশ পা-ও হাঁটা ভুলে গেছে।"

"তোর কানে কানে বলেছে রে ?"

"রাইটিং করে বলেছে ভাই, ইয়ার্কি মেরো না। প্রমাণ চাও দিতে পারি।"

"প্রমাণ দিতে হবে না তোকে। তুই আমাদের ঠাট্টা করবি না। মেয়েরা এখন এদেশের প্রাইম মিনিস্টার। সিংহলের প্রাইম মিনিস্টার।"

শমীক বলল, "অবশ্য অবশ্য। এখন তোদের যুগ। কী বলে রে, তোরা সব লিব মুভমেণ্ট করে বেড়াচ্ছিস!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হলে হাঁট। তোর স্ট্রেংথ দেখা।"

দুজনেই হাঁটতে লাগল। এলোমেলো কথা বলছিল হাঁটতে হাঁটতে। হাসছিল থেমে থেমে। শীতের ধুলো এই মাঠেও কোথা থেকে উড়ে এসে ওদের মুখে জমছিল। বাতাসে চুল উসকোখুসকো হল। সামান্য ঘাম জমল মুখে পরিশ্রমের জন্যে।

এই ভাবেই পড়ন্ত দুপুরে, বিকেলের গায়ে গায়ে ওরা আউটরাম ঘাটে এসে পৌঁছল। মৃদুলার তেষ্টা পাচ্ছিল খুব। ক্লান্ত লাগছিল।

শমীক বলল, "চ তোকে ওই দারুণ দোকানটায় চা খাইয়ে আনি।"

জল খেয়ে চা খেয়ে শমীকরা গঙ্গার ঘাটে এসে বসল। বিকেল হুহু করে গড়িয়ে যাচ্ছে, যেন গঙ্গার জলের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে কোথাও। দূরে গোটা দুয়েক ছোট জাহাজ দাঁড় করানো। বাঁধানো পথ দিয়ে কত লোক হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এ-পাশে ও-পাশে বসে আছে অনেকে। শীতের বাতাস গঙ্গার জল ছুঁয়ে আরও কনকনে হয়ে গায়ে মুখে এসে লাগছিল।

একটু নিরিবিলিতে বসল দুজনে। পাশেই একটা মস্ত গাছ। বিকেলের রোদ আর গায়ে লাগছে না, মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। গঙ্গার ওপারে যেন এখনও রোদের ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

শমীক সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে খেতে লাগল। মৃদুলার কেমন অবসাদ লাগছিল। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ভারী। সে চুপ করে বসে থাকল।

শমীকও কথা বলছিল না। দুজনেই নীরব।

বাতাসে একটা পাতা উড়ে গিয়ে জলে পড়ল। শমীক পাতাটা দেখল। জলের স্রোতে পাতাটা ভেসে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কতদূর চলে গেল। তারপর আর দেখা গেল না। তবু শমীক তাকিয়েই থাকল।

হঠাৎ হাই তুলে মৃদুলা বলল, "কী ভাবছিস?"

শমীক সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। বলল, "দেখ মৃদু, কখনো কখনো মনে হয় জীবনের এই মুহূর্তগুলো কেমন যেন মায়ায় ভরা। ভাল লাগে, মন কেমন আবেগে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আবার খানিকটা পরেই অন্য রকম লাগে।"

ঠাট্টা করে মৃদুলা বলল, "দার্শনিকতা করছিস?"

"ইচ্ছে করে ও জিনিসটা কি করা যায়, ভাই! যখন হয় নিজের থেকেই হয়ে যায়।"

"এখন তোর কী হচ্ছিল ?"

"একটা কথা ভাবছিলাম। ধর, ওই যে গাছের পাতাটা জলে পড়ল, দেখতে দেখতে ভেসে গেল, ওই পাতাটা আমার চোখের সামনে অন্তত আধ মিনিটটাক ছিল—তারপর হারিয়ে গেল। কিন্তু সত্যিই কি হারালো ? হয়ত এতোক্ষণে আরও কোথা দিয়ে ভেসে চলেছে—" বলে শমীক সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল সামান্য, তারপর বলল, "দেখ মৃদু, আমরা যখন এই নদীর পাড়ে বসে পাতাটাকে দেখছি—তখন মনে হচ্ছে ওটা হারিয়ে গেল ! কিন্তু যদি একটা গাছ-পিঁপড়ের মতন ওই পাতার ওপর বসে থাকতাম, আর পাতাটা টুপ করে খসে গিয়ে জলে পড়ত, পড়ে ভেসে যেত, তা হলে কী মনে হত ?"

মৃদুলা কথাটা ধরতে পারল না। বলল, "কী মনে হত কেমন করে বলব !"

শমীক বলল, "তা হলে মনে হত, পাতাটা ভেসে যাচ্ছে না, নদীর এই পাড়ই চলে যাচ্ছে।"

"রেলের কামরায় বসে অনেক সময় এই রকম মনে হয়, তাই না ?" মৃদুলা বলল।

"হয়, দু-চার মুহূর্তের জন্যে কখনও ও-রকম হয়। কিন্তু রেলগাড়িটা এত বড় আর আমাদের বাস্তবের বোধটা এমনই চড়া থাকে যে ওটাকে আমরা চোখের ভুল বলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি কিন্তু একটা ছোট্ট পাতার ওপর আরও ছোট্ট একটা পিঁপড়ের মতন বসে থাকলে—এই নদীর স্রোত, দু পাশের পাড় সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকার কথা নয়।...আমার কী মনে হয় জানিস মৃদু, আমরা এই অনন্ত সময় ও বিশাল অসীমতার মধ্যে এইভাবে বেঁচে আছি। আছি না নেই তাও এক-এক সময় সন্দেহ হয়। এসব কথা মনে হলে বেঁচে থাকা না-থাকা একই রকম মনে হয়, ইনসিগনিফিকাণ্ট। কী যায় আসে আমি থাকি আর না-থাকি !"

মৃদুলা চুপ করে থাকল।

গঙ্গার জল যে কখন কালচে হয়ে আসতে শুরু করেছে ওরা খেয়াল করে নি। শূন্যের সব রোদ আলো পশ্চিমের আকাশে উঠে গেল। উত্তরের বাতাস আরও ধারালো হয়ে গায়ে লাগছিল।

বিকেল সবে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। ছায়া নামছে। সীসের রঙ ধরে আসছে। চারপাশে গঙ্গার ছলছল শব্দ।

শমীক আচমকা বলল, "মৃদু, আমি তো এইসব নিয়ে ভুলে থাকতে পারতাম। জীবনের অনেক অনুভূতি খুব সাধারণ, সহজ, নিত্যকার জগতের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমার কী হল রে? কার পেছনে আমি তাড়া করে বেড়াচ্ছি? কী হবে বল তো এই ময়লা ঘেঁটে?"

মৃদুলা কিছু না বুঝলেও অনুভব করতে পারল শমীক বড় দুঃখ ও অশান্তি বোধ করছে। কার্ডিগানের গলার দিকের বোতাম বন্ধ করতে করতে মৃদুলা বলল, "কিসের ময়লা ঘাঁটছিস?"

"ঘাঁটছি! ঘাঁটছি রাগে। রাগে আর ঘেন্নায়। আমাদের এমন করে তারা দেউলিয়া করে রেখে গেল কেন?"

"কাকে তুই দেউলিয়া করে রাখা বলছিস?"

"কেন, আমরা। আমরা কী? কী আছে আমাদের? তুই কি বুঝতে পারিস না—আমরা কেমন করে বেঁচে আছি! নচ্ছারের মতন, লোফারের মতন, সার্কাসের ভাঁড়ের মতন। একটা পুরো জেনারেশান হয় চোর বদমাশ গুণ্ডা হয়ে গেল, না-হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে জলে বৃষ্টিতে ভিজে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড করিয়ে দিন কাটাল। এ ছাড়া আর কী করল? আমরা আর কী করতে পারলাম, বল?"

যেন কিছুই করা গেল না বলে যন্ত্রণার মুখ করে মাথা নাড়ল শমীক। বলল, "শোন মৃদু, আমি ভেঙে বলছি এটা কোনো বাঁচা নয়। এ আমাদের অন্ত্যেষ্টি। ঘৃণা আর নোংরার মধ্য থেকে আমরা এসেছি। আমরা আরও ঘৃণিত হব। আমাদের মাথার ওপর কেউ

নেই। কেউ গ্রাহ্য করে না—আমাদের জীবন সৎ হল না অসৎ হল, আমরা নরকে ডুবলাম না গলা ভাসিয়ে বেঁচে থাকলাম।"

মৃদুলা যেন শমীকের ক্রোধ এবং দুঃখ অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু শমীক কি রাগের মাথায় একপেশে হয়ে পড়ছে না? সবই যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে আমরা কেমন করে বেঁচে আছি? সকলেই যদি নচ্ছার গুণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে শমীকের মতন ছেলেরা এখনও টিকে থাকল কী করে?

মৃদুলা বলল, "শমী, তুই বড় অবিশ্বাসী হয়ে উঠছিস।"

"হ্যাঁ, হয়ে উঠেছি।"

"কেন হচ্ছিস? সব খারাপ হতে পারে না। ভগবান যদি সকলকেই খারাপ করে দিত, তবে আমরা বাঁচতাম কী করে?"

শমীক যেন বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই তোর ভগবানকেই দেখ মৃদু, আমি দেখতে চাই না। পারিও না।···আমি কোনো কিছুই আর বিশ্বাস করি না। তোর ভগবানকে তো নয়ই।"

"কী বলিস। শুধু অবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা যায়?"

"যায়।···লোরেনজোরা ওইভাবে বেঁচে ছিল। ঘৃণার জগতে ওরা ঢুকতে চায় নি। নিজেদের ধ্বংস করেছিল। আত্মধ্বংসের এই বীজ নিয়ে আমরা জন্মেছি।"

"লোরেনজো? লোরেনজো কে?"

"ও! তুই তো জানিস না।···সেই বইটার কথা তোর মনে আছে? সিনেমা দেখতে গিয়ে দেখা হল না। আমি একটা পুরোনো বই কিনেছিলাম: 'দিস ইজ ফর মাইসেলফ। মনে পড়ছে।"

মৃদুলা মাথা হেলিয়ে বলল, তার মনে পড়েছে।

শমীক বলল, "শোন মৃদু, জীবনের এটাই বড় তামাশা। জন্মটা আমাদের হাতে নয়, কিন্তু জন্মের যন্ত্রণা আমাদের। শমীক তার গলায় ফাঁস নিয়ে জন্মেছিল। এই ফাঁস নিয়েই সে মরবে না এই তার প্রতিজ্ঞা।"

মৃদুলা কিছু বলতে পারল না, তার বুক যেন টনটন করে উঠছিল।

নয়

অমৃতর বিয়ের দিন এগিয়ে আসছিল। পৌষ শেষ হয়ে মাঘ পড়েছে। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের আসা-যাওয়া এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৌরী আসছেন মাঝে মাঝেই স্বামীকে সঙ্গে করে। শচী তো আছেই। না আসতে পারলে ফোনে ডাকাডাকি করছে। একমাত্র পুরবীই দু-একবার মাত্র এসেছে। বিয়ের আগে আগে অবশ্য এসে পড়বে।

এ-বাড়ির কথাবার্তা থেকে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছিল। চারুপ্রসাদের বিয়ের পর আজ তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা বছরের মধ্যে কোনো ছেলের বিয়ে এ বাড়িতে হয় নি। গৌরী, শচী আর সবার শেষে পুরবী; পর পর মেয়ের বিয়েই ঘটে গিয়েছে; এই প্রথম ছেলের বিয়ে, দেবপ্রসাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছেলের কাজ। উৎসব-অনুষ্ঠানের ঘটাটা তাই বোধ হয় কমবেশী বড় করেই করার ইচ্ছে সকলের।

ঘরবাড়ির কাজকর্ম প্রায় শেষ হয়ে এল। আর সপ্তাহখানেক হলেই সব শেষ হয়ে যাবে। বাড়ির কাজ শেষ হওয়ামাত্র ছাদে মেরাপ বাঁধার বাঁশটাশ জমা হতে থাকবে। সারা ছাদ জুড়ে মেরাপ বাঁধা হবে, নিমন্ত্রিত লোকজন তো কম হবে না, শ পাঁচেক। আজকের দিন বলে সামান্য কাটছাঁট হল। নয়ত দেবপ্রসাদ যে কী করতেন বোঝা মুশকিল। গৌরী বলছিলেন 'দাদা একেবারে বাবার ধাত পেয়েছে, কাজের সময় খরচ-খরচার হিসেব করবে না। তবে বাবার এত ব্যস্ত ভাব ছিল না, দাদা বড় বেশী ব্যস্ত মানুষ।'

বাড়িতে এতরকম ঘটে যাচ্ছে অথচ শমীক নির্বিকার। তার কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। বিয়ে নিয়ে কতরকম গল্প, কত

আলোচনা, শমীককে তার মধ্যে পাওয়া গেল না কোনোদিন। আত্মীয়-স্বজন যারা আসছে তারা ব্যাপারটা লক্ষ করছে, ডাকাডাকি করছে শমীককে ; সে সব হইচই, গল্পগুজব থেকে সরে থাকছে। গৌরী যখন প্রথমবার এসেছিলেন অতটা খেয়াল করেন নি। দ্বিতীয়বার যখন এলেন তাঁর চোখে পড়ল ব্যাপারটা। দাদা-বউদির মুখে সব শুনলেন। তারপর ভাইপোকে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে হতভাগা, তোর দাদার বিয়ে, তুই কোথায় লাফঝাঁপ করে বেড়াবি, কর্তামি করবি, তা না ঠুঁটো হয়ে বসে আছিস ?' শমীক বলল, 'দেখো পিসীমা, সবাই যদি নাচে তা হলে বাজনা বাজাবে কে ?' গৌরী ভাইপোকে নিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ, দশ রকম কথা বললেন, কোনো লাভ হল না।

পুরবীর নিজের একটা জ্বালা ছিল, বাড়ির বড় কেউ সেটা জানত না। শমীক কিছু কিছু জানত। এ-বাড়িতে শমীকের সঙ্গে দেখা হলে পুরবী মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, 'ওর আর কোনো খবর পাস না, না ?' শমীক কেমন মুখ নীচু করে বলত, 'না।' পুরবী যার কথা জিজ্ঞেস করত সে শমীকের বন্ধু নয়, কিন্তু শমীক তাকে দেখেছে, চিনত। সে যে কোথায় আছে আজকাল, কী করছে—শমীক জানত না, খোঁজ নেবার চেষ্টাও করে নি। তবু পুরবী তার কথা জিজ্ঞেস করলে শমীক কেমন বিব্রত বোধ করত, দুঃখ পেত।

তারই সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। কমলেশের বাবা মারা গিয়েছেন খবর পেয়ে শমীক একদিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কমলেশের বাড়িতে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল শমীকের। কথায় কথায় সামান্য রাত হয়েছিল, ফেরার পথে ট্রামে তার সঙ্গে দেখা। শমীক প্রথমে বুঝতে পারে নি, তার পাশে জায়গা ছিল—ফাঁকা জায়গা পেয়ে বসে পড়ার পর এক সময়ে খেয়াল হল শমীকের।

'আরে, আপনি ?'

'কোথায় ?'

'এক বন্ধুর বাবা মারা গিয়েছেন, তার কাছে গিয়েছিলাম।'

'ও!'

'আপনার কী খবর? ভাল আছেন?'

'এই তো···।'

'অনেক দিন আপনাকে দেখি নি।'

'না দেখারই কথা।'

'কোথায় আছেন আজকাল?'

'ঠিক নেই।···আচ্ছা, আমি এখানে নামব। চলি।'

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের কাছে সে নেমে গেল। নাটকীয়ভাবে নেমে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

বসুধা অন্য সিট থেকে পাশে এসে বসে চাপা গলায় বলল, 'মৃগাঙ্ক না?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছিলাম জেলে আছে।

শমীক কিছু বলল না। তার বড় আশ্চর্য লাগছিল। মৃগাঙ্ক তো পুরবীর কথা জিজ্ঞেস করল না। কেমন আছে পুরবী- এটা অন্তত জানতে চাইল না কেন? ঘৃণায় না রাগে? না কি অবজ্ঞা দেখাল? এমনও হতে পারে পুরবীর কথা ভাবার সময় আর তার নেই। শমীকের কেন যেন বিরক্তি লাগছিল। কার ওপর সে বুঝতে পারল না। অথচ ক্রমেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

বাড়ি ফিরতেই করবী খবর দিল, বাবা খোঁজাখুঁজি করছে।

শমীক বলল, "বল গে যা, জামাটামা ছেড়ে আসছি।"

"তাড়াতাড়ি কর। জ্যেঠামণির খাবার সময় হয়ে আসছে।"

"আজ না দিদি আসার কথা ছিল?"

"সন্ধ্যেবেলায় এসেছে।"

"পুরবী?"

"ওর দেরি আছে।"

জামাটামা বদলে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে শমীক গায়ে একটা শাল চাপিয়ে দেবপ্রসাদের ঘরে গেল।

দেবপ্রসাদ নিজের ঘরে বিছানায় বসে ছিলেন। চারুপ্রসাদ বিছানার কাছাকাছি ভারী একটা সোফায় বসে। শীতের দরুন মেঝেতে পা রাখা যায় না বলে পুরোনো কার্পেটটা পাতা রয়েছে। আশালতাও বসে আছেন চারুপ্রসাদের কাছাকাছি। শচী বাবার পিঠের দিকে বিছানায় বেঁকা হয়ে বসে আছে। দেবপ্রসাদের কোলের পাশে লম্বা ধরনের একটা বাঁধানো খাতা। কিছু কাগজ; একটা কলম।

চারুপ্রসাদের এ সময় নীচে মক্কেলদের কাছে বসে থাকার কথা। অবশ্য তিনি আজ ক'দিন তা পারছেন না। আগে আগেই উঠে আসতে হচ্ছে। নীচে কানাইবাবু যথারীতি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, গোবিন্দ মুহুরীও বসে থাকে মাঝে মাঝে। মক্কেলরা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে যান, না-হয় আপাতত তাঁরা চারুপ্রসাদকে খানিকটা ছুটি দিয়েছেন।

"কোথায় গিয়েছিলি?" আশালতা জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে।

"ভবানীপুর।"

ভবানীপুর শুনে আশালতা দু মুহূর্তের জন্যে শচীর দিকে তাকালেন। শচীর শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুর।

"ভবানীপুরে কেন রে?" আশালতা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার এক বন্ধুর বাবা মারা গিয়েছেন, দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

চারুপ্রসাদ বললেন, "কী হয়েছিল?"

"কী যেন বলল; নিওমোনিয়ার মতনই, আরও খারাপ ধরনের নিওমোনিয়া...।"

"বয়স কত হয়েছিল?"

"ষাট-বাষট্টি।"

চারুপ্রসাদ একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর শমীককে বসতে বলে বড় ভাইয়ের দিকে তাকালেন। "নিওমোনিয়ায় এখনও লোক মারা যায় এ বড় আশ্চর্য কথা। এত রকম নতুন নতুন ওষুধবিষুধ বেরুচ্ছে, এখন নিওমোনিয়া টাইফয়েড এমনকি টিবি পর্যন্ত আর রোগ নয় বলে শুনি।"

আশালতা কপাল দেখিয়ে বললেন, "যতই যা বেরোক, সবই ভাগ্য! ভাগ্যে যেদিন আছে সেদিন চোখ বুজতেই হবে।"

শমীক বসল। কাকার উলটো দিকে।

চারুপ্রসাদ বললেন, "তা ঠিক, জন্ম মৃত্যু বিবাহ···ভাগ্য ছাড়া আর কি! আমাদের ঠাকুরদা—বাবুকর্তা শুনেছি ঘুমের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন।···কত আর বয়েস তখন ঠাকুরদার? বছর পঞ্চাশ।"

দেবপ্রসাদ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, "আমাদের বংশের অ্যাভারেজ লাইফ ফিফটি থেকে ফিফটি ফাইভ। ঠাকুরদা বাবা—সবাই ওই পঞ্চাশ-পঞ্চান্নের মধ্যে গিয়েছেন। সেদিক থেকে আমি সাতষট্টির কাছাকাছি এসে পড়েছি। এতদিন বাঁচবার কথা আমাদের নয়।"

আশালতা স্বামীর কথায় যেন অখুশী হয়ে বললেন, "এমন করে কথা বলছ যেন কত অন্যায় করে ফেলেছ। যাকগে, ওসব বাঁচাবাঁচির কথা বাদ দিয়ে কাজের কথা বলো।"

শচী বলল, "শমী তা হলে কাকিমাকে সঙ্গে নিয়ে বেলতলায় যাক, বেলতলার দিকে যেদিন যাবে সেদিন কসবা টালিগঞ্জ সব সেরে আসতে পারবে।"

আশালতা বললেন, "তোদের যেদিন যেদিন আর শেষ হবে না। দশ-বারোটা দিনও আর বাকি নেই, এখনও গড়িমসি। শেষ পর্যন্ত অর্ধেক লোক বাদ পড়ে যাবে।"

শচী হাত নেড়ে বলল, "আছে বাবা, আছে। তুমি অযথা ব্যস্ত

হয়ো না তো। নেমন্তন্নর ব্যাপারটা এমনিতেই বড় ঝঞ্ঝাটের, যতই করো শেষ পর্যন্ত কিছু খুঁত থেকে যায়।” বলেই শচী ভাইয়ের দিকে তাকাল। “এই শমী, এখন আর হাত-পা গুটিয়ে তোর বসে থাকলে চলবে না। অনেক নেমন্তন্ন করার আছে। তোকে বেরোতে হবে।” বলে শচী দেবপ্রসাদের কোলের কাছে রাখা পুরোনো খাতা, একতাড়া কাগজ দেখাল।

খাতাটা শমীক আগেও দেখেছে। ঈশ্বরদাসের আমলের খাতা. লোক-লৌকিকতা, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে কাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে তাদের নামধাম ওই খাতায় লেখা আছে। ঈশ্বরদাস যেখানে শেষ করেছিলেন দেবপ্রসাদ সেখান থেকে শুরু করে তালিকা আরও বাড়িয়েছেন। অবশ্য ঈশ্বরদাসের তালিকা থেকে অনেকে বাদ পড়ে গেছেন, কারণ হয় তাঁরা মৃত না-হয় সেই পরিবারের পরবর্তীদের সঙ্গে দেবপ্রসাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই।

দেবপ্রসাদ ছেলের দিকে তাকালেন, বললেন, “তুমি তোমার কাকিমাকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবে আমি তা আলাদা করে লিখে রেখেছি। দিন দুয়েক তোমায় বেরুতে হবে।”

শমীক বলল, “তোমাদের যাওয়াই তো ভাল।”

দেবপ্রসাদ বললেন, “ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের কাছে আমাকে, তোমার কাকাকে আর মা-কাকিমাকে যেতেই হবে। বাকি কিছু কিছু আছে যেখানে আমাদের তরফে তুমি আর মেয়েদের মধ্যে হয় তোমার মা না-হয় কাকিমাকে যেতে হবে।”

শমীক বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমাদের যারা আত্মীয়-স্বজন নয় তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলবার কী দরকার, চিঠি ছেড়ে দাও।”

দেবপ্রসাদ কেমন অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। আশালতা এবং চারুপ্রসাদও।

এমন সময় ভেজানো দরজা ঠেলে করবী এল। ট্রে করে কাপ

চারেক কফি করে এনেছে। বোধ হয় চারুপ্রসাদ আগেই বলেছিলেন।

দেবপ্রসাদের খাবার সময় হয়ে এসেছে, তিনি কফি নিলেন না। এমনিতেও কফি তিনি পছন্দ করেন না। চারুপ্রসাদ আর শমীককে কাপ দিল করবী। তারপর নিজে একটা কাপ নিল। নিয়ে আশালতার গা ঘেঁষে বসল।

আশালতা ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর সবতাতেই ক অবাক কথা। ভাই-বোন নিজেদের লোক, তা বলে ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন কি চিঠি পাঠিয়ে হয়?"

শমীক কফিতে চুমুক দিয়ে উদাসীনের গলায় বলল, "হলেই হয়।"

অসন্তুষ্ট হয়ে দেবপ্রসাদ বললেন, "না, হয় না।"

"কেন?"

ভৎসনার চোখে ছেলেকে দেখতে দেখতে দেবপ্রসাদ বললেন, "এটা সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতার ব্যাপার, ভদ্রতা-সভ্যতার কথা। কাউকে নেমন্তন্ন করা ভিক্ষে দেওয়া নয়, তাকে সমাদর করে শুভ কাজে আসতে বলা।"

শমীক বাবার কথা মন দিয়ে শুনল কিনা বোঝা গেল না। বলল, "তোমাদের এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে না। যা হয়ে আসেছে, বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে—সেটাকেই তোমরা জিইয়ে রাখতে চাও। কিসের শুভ কাজ বলছ? ধরো, কেউ একটা চাকরি পেল, তার চেয়ে শুভ তো আজকালকার দিনে কিছু নেই, তখন তো চিঠি দিয়েই সেটা জানানো হয়। তাতে কারও সম্মানে লেগেছে, স্বীকার করব না বলেছে—এমন আমি শুনি নি।"

ছেলের যুক্তি শুনে দেবপ্রসাদ অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

চারুপ্রসাদ হেসে হেসেই বললেন, "শমী, তোর মাথা খারাপ

হয়েছে। চাকরি এক জিনিস আর সামাজিকতা অন্য জিনিস। লোকে সেখানে সম্মান চায়, মর্যাদা চায়। তা ছাড়া প্রত্যেক পরিবারের নিজের একটা একটা শিক্ষা রুচি আছে। আমরা যদি চিঠি পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করি তা হলে কী ভাববে আমাদের! তাই কী হয়?"

দেবপ্রসাদ ছেলেকে বললেন, "তোমার যদি যেতে ইচ্ছে না হয়, নিজেকে খুব ব্যস্ত মানুষ ভেবে থাকো, তুমি যেয়ো না, আমি বা তোমার কাকা যাব।"

"ওটা তোমার রাগের কথা।"

"রাগ হবে না তো কি আহ্লাদ হবে," আশালতা ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, "বাড়িতে একটা কাজ, আর তুই এ-বাড়ির ছেলে হয়ে কোনো একটা কাজও করতে পারবি না? কেন? বিয়েটা তোর দাদার, না রাস্তার লোকের?"

শমীক বলল, "আমি কিন্তু মা বলি নি যে আমি কাকিমার সঙ্গে যাব না। আমি বলছিলাম, যাদের তোমরা কম খাতির দেখাতে চাও তাদের বেলায় আমাকে পাঠাচ্ছ কাকিমার সঙ্গে। তাই যদি হয় তবে চিঠি পাঠাতে দোষ কী?"

মাথা নেড়ে চারুপ্রসাদ বললেন, "তা নয়, তা নয়; দাদার এই বয়েস—এত রকম ঝক্কি। দাদার পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া কি সম্ভব। আমারও কোর্ট কাছারি সেরে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো সম্ভব কি না ভেবে দেখ। বাড়ির পাঁচজনে মিলে কাজ ভাগ করে নিলে সুবিধে হয়।"

শমীক থামল না। বলল, "কাকা, তোমাদের এটাই হল দোষ। যা সত্যি সেটা স্বীকার করবে না। আমি তোমাদের সামাজিকতা জানি, দেখছি। তোমরা মানুষ বুঝে সামাজিকতা দেখাও।"

শচী এবার কড়া গলায় বলল, "শমীর কথাবার্তা দিন দিন যা হয়ে উঠছে, ছি ছি!"

আশালতাও রাগের গলায় বললেন, "আমরা কী দেখাই না-

দেখাই সেটা তোকে বিচার করতে হবে না। তুই সেদিনের ছেলে নিজের বাপ-কাকার ভালমন্দ বিচার করতে বসেছিস? লজ্জা করে না।"

চারুপ্রসাদ ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্যে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর যদি খারাপ লাগে তুই যাস না।"

"ওকে যেতে হবে না," দেবপ্রসাদ বললেন, "আমি অন্য ব্যবস্থা করব।"

শমীক বাবার দিকে দু-মুহূর্ত তাকিয়ে নিয়ে বলল, "তোমার এই রাগের কোনো মানে হয় না। আমি যাব বলেছি। এরপর যদি অন্য ব্যবস্থা করতে চাও করো।"

দেবপ্রসাদ এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে ছেলের দিকে তাকালেন না।

আশালতা বললেন, "সব জিনিসের সীমা আছে, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। সাপের পাঁচ পা দেখেছ তুমি? এ-বাড়ি, এই বংশ —এরা তোমার নয়? এদের মান-সম্মান তোমার নয়? তুমি কি আলাদা?"

চারুপ্রসাদ বউদির রাগ সামলাবার জন্যে বললেন, "আঃ, তুমিও তো বউদি সেইরকম। ও-কী একটা বলল, ওর কথায় তোমার কান দেবার দরকার কী!"

শমীক ভাবছিল উঠে যাবে। তারও ভাল লাগছিল না।

শচী বলল, "এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের একেবারে উলটো হয়ে যাচ্ছে শমী। এটা বড় খারাপ।"

শমীক বলল, "সোজা হয়েই বা তোমরা কে কী করছ?"

শচী বুঝতে পারল না। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

দেবপ্রসাদ কথাটা শুনেছিলেন, বললেন, "না, এরা কেউ কিছুই করতে পারে নি। তুমি করছ। তুমি করবে। এই বয়েসে আমি আর সেটা দেখতে চাই না, আমায় যেতে দাও তারপর যা ইচ্ছে হয় করো।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোমার ওই সব বেয়াড়াপনা আমায় যেন
দেখতে না হয়।"

শমীক আর কথা বলল না। উঠে পড়ল।

শমীক চলে যাবার পর ঘর যেন কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল
সবলেই চুপচাপ। শেষে আশালতা কেমন এক যন্ত্রণার মধ্যে বললেন
"ঠাকুরপো, আমি তোমায় বলছি, ওই ছেলে যে বলত—আমি সব
ভাঙব, সত্যি সত্যিই এ-বাড়ির সমস্ত কিছু ও ভাঙবে। আমাদের
সুখশান্তি ও নষ্ট করছে, আরও করবে।"

চারুপ্রসাদ বেদনা বোধ করছিলেন। বউদির মুখের দিকে
তাকিয়ে থাকলেন কয়েক পলক, তারপর দাদাকে দেখলেন।
দেবপ্রসাদও আহত, ক্ষুব্ধ, দুঃখিত হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বসে
ছিলেন।

চারুপ্রসাদ বললেন, "আজকালকার ছেলেরা এ-রকম হয়েছে
বউদি; আমাদের সময় কি আর আছে! তা বলে তুমি
যা ভাবছ তা হবে না। শমী এই বাড়ি, এই সংসারের
ছেলে, তার রক্তের মধ্যে আমরা রয়েছি। সে সত্যিই কিছু
ভাঙতে পারবে না।"

আশালতার দু চোখ ছলছল করছিল। করবী তার জ্যেঠাইমার
কোলের ওপর হাত রেখে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলল, "তুমি
মামণি ছোড়দাকে বড্ড বকলে। ছোড়দার মনে লেগেছে।"

"লাগুক," আশালতা বললেন; কিন্তু তাঁর চোখের জল গালের
কাছে গড়িয়ে পড়ল।

খানিকটা আগেও এই ঘরের মধ্যে আসন্ন উৎসবের আবহাওয়া
ছিল। নানা ধরনের কথা হচ্ছিল অমৃতর বিয়ের সম্বন্ধে। বাড়ির
গাড়ি ছাড়াও একটা গাড়ি চাই ছোটাছুটির জন্য, গৌরী গাড়ি পাঠাতে
বলেছে; বড় জামাই—মানে শচীর বর—কোন্ বন্ধুর সঙ্গে কথা
বলেছে বউভাতের দিন মুভি ক্যামেরায় বিয়েবাড়ির ছবি তোলানো

হবে, শচী হেসে বলেছিল বউ-বরণের সময় সে রূপোর থালায় দুধ-আলতা গুলে রাখবে, এই সব।

সেই হাসিখুশী আনন্দের আবহাওয়া হঠাৎ এ-রকম হয়ে যাবে কে ভেবেছিল।

আশালতা উঠে গেলেন।

একটু পরে শচীও চলে গেল, করবীকে নিয়ে।

দুই ভাই বসে থাকলেন।

দেবপ্রসাদ পরে বললেন, "ও কেন এমন হয়ে যাচ্ছে আমি হাজার ভেবেও বুঝতে পারছি না চারু। উই ডিড নাথিং রং টু হিম। এত আদর যত্ন ভালবাসার মধ্যে মানুষ হয়েও কী করে শমী এ-রকম হয়!…বেশী আদর-আস্কারা পেয়েছে বলেই কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল?"

চারুপ্রসাদ নিজেও বুঝতে পারছেন না— কেন এ-রকম হল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শমীক বুঝতে পারল তার ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। মাথা ভার, গায়ে-হাতে ব্যথা, গলার মধ্যে জ্বালা করছিল। কেমন করে ঠাণ্ডা লাগল শমীক বুঝতে পারল না। কাল মাঝরাত পর্যন্ত ঘুম আসে নি। ঘুম না আসলেও চলত, কিন্তু মাথার মধ্যে এত রকম ভাবনা তাকে খোঁচাতে লাগল যে, কেমন একটা উত্তপ্ত ভাব তার চোখেমুখে নিঃশ্বাসে মিশে যেতে লাগল। তখন মনে হল, মাথাটা ধরে আসছে, গরম লাগছে। সামান্য হাঁফ-ধরা ভাব হচ্ছিল। শমীক এই অস্বস্তিটা সহ্য করতে না পেরে চোখেমুখে জল দিয়ে আসতে বাথরুমে চলে গেল। বাড়ি তখন অসাড়। অন্ধকার। কনকনে শীত যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে শমীক একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেল, খেয়ে শুয়ে পড়ল।

সকালে শরীরটা বেজুত লাগলেও গায়ে মাখতে চাইল না শমীক।

বাড়িতে থাকতেও ভাল লাগছিল না। আজ রবিবার, মিস্ত্রী-মজুর যদিও আসবে না—তবু লোকজন আসতে শুরু করবে সকাল থেকেই। তারপর সারাদিন হইহই চলবে।

বসুধার বাড়িতে রবিবার সকালে একটা আড্ডা বসে। পুরোনো বন্ধুবান্ধবেরা জড় হয়। শমীকের বাড়িতেও আগে বসত মাঝে মাঝে; বসুধার বাড়িতে আসা-যাওয়ার সুবিধে বলে ওই বাড়িটাই সকলের পছন্দ।

চা খেয়ে শমীক বসুধার বাড়ি চলে গেল।

বসুধার বাড়িতেই জ্বর এল শমীকের। রথীনের সঙ্গে তর্কটাও শেষ করা গেল না, গোটা দুয়েক ট্যাবলেট খেয়ে বাড়ি ফিরতে হল।

বাড়িতে তখন হাট বসে গেছে। কত লোকই না এসেছে। বাচ্চাকাচ্চাও জুটেছে একগাদা।

শমীক নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

স্নান হল না, করতে ইচ্ছে হল না তার; শুকনো কিছু খেয়ে দরজা বন্ধ করে বই নিয়ে শুয়ে পড়ল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না।

বিকেলের দিকে করবীর ডাকে ঘুম ভাঙল। জ্বর এসেছে আবার।

চায়ের সঙ্গে আবার ওষুধ খেল শমীক। করবী এনে দিল। বলল, "তোর গলা খুব ভারী হয়ে গেছে ছোড়দা, সর্দি হয়েছে। এই ওষুধ খেয়ে চুপ করে শুয়ে থাক।"

শুয়েই থাকল শমীক। বিকেল মরল; অন্ধকার হয়ে গেল সব; ঘরের বাতি জ্বালিয়ে আবার কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে থাকল।

সন্ধ্যের পর মা এল।

ছেলের গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে আশালতা বললেন, "গায়ে জ্বর রয়েছে তোর।"

শমীক সোজা হয়ে শুতে শুতে বলল, "ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে।"

"জ্বর দেখেছিস ?"

"না।"

"দেখিস নি কেন ? রুবিকে ডাকি···।"

"দেখতে হবে না। কাল ছেড়ে যাবে। সর্দিজ্বর।"

আশালতা তবু করবীকে ডাকলেন। করবী কাছাকাছি ছিল না।

ছেলের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আশালতা হয়ত গতকালের কথা ভাবছিলেন। তাঁর নিজেরও কাল ভাল লাগে নি। পরে বড় অশান্তি ভোগ করেছেন। স্বামীর সঙ্গেও রাত্রে মন কষাকষি হয়েছে।

কিছুক্ষণ ছোটখাট কথার পর আশালতা বললেন, "তোর মাথায় কী আছে বলবি ?"

"কেন ?"

"তাই দেখছি। এত বয়েস হয়ে গেল তবু কিছু বুঝতে শিখলি না ?"

শমীক মার গায়ের আঁচলটা টেনে নিল, নিয়ে কপাল গাল মুছল—সামান্য ঘাম-ঘাম লাগছে ; জ্বরটা আবার কমছে বোধ হয়। বলল, "কী বুঝতে শিখলাম না ?"

"সংসারের কিছু বুঝতে শিখলি না। এই যে কালকে অমন একটা কাণ্ড করলি, ও-রকম কি কেউ করে ?"

"বাঃ, আমি আবার কী করলাম।"

"করলি না !···তুই তো ছেলেমানুষ নোস। এটা কেন বুঝলি না—তোর কথায় ঠাকুরপো কী মনে করতে পারে ! হাজার হোক, বিয়েটা তো তার ছেলের। তোর কাকার মনে হতে পারে এই বিয়েতে বাড়ির কর্তব্যটুকুও তুই করতে চাস না। এটা কি ভাল ?"

শমীক মার মুখ দেখতে দেখতে বলল, "কাকা তা ভাববে না।"

"জানি। তোর কাকাকে আমি চিনি না ! তুই দেখছিস তোর জন্ম থেকে আর আমি দেখছি নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে ঢোকার পর।"

"তা হলে আর তুমি ভাবছ কেন?"

"ভাবছি কেন জানিস। নিজের গায়ের চামড়া নিজেরই, পরের নয়। খুব বড় জিনিসে দুঃখ পেলে বোঝা যায়, ছোট জিনিসে দুঃখ পেলে বোঝা যায় না। ঠাকুরপো কোথাও একটু দুঃখ পাক—আমরা চাই না। তোর ঠাকুরদা মারা যাবার পর তোর বাবা কত যত্ন করে তোর কাকাকে মানুষ করেছে জানিস?"

শমীক মা'র হাতটা টেনে নিয়ে চোখের ওপর রাখল। তার চোখের তলায় চাপা ব্যথা। সামান্য চুপ করে থেকে শমীক বলল, "আমি জানি। কাকা আমায় কত ভালবাসে সেটা তুমি আমায় কেন বলে দিচ্ছ! সবাই জানে।"

"জেনেও তুই ও-রকম কেন করলি?"

"আমি সত্যিই কিছু করি নি মা। আর যদি বলো খারাপ করেছি তাহলে আবার বলব, বাবা যতই বলুক, তোমরা মানুষকে খাতির করবার বেলায় একই রকম করো, তা কিন্তু করো না। যাক্ গে—ওসব কথা ছেড়ে দাও। আমার জ্বর কালকেই ছেড়ে যাবে। কাকিমার সঙ্গে আমি চরকিপাক মেরে বেড়াব। ব্যাস্—আর কথা নয়।"

আশালতা আর কী বলবেন। চুপ করে গেলেন।

করবী সন্ধ্যের মুখে বোধ হয় শাড়ি-জামা বদলাচ্ছিল, ছাপা শাড়ি, ঘন নীল জামা, মাথায় মস্ত বিনুনি· ঘরে এসে বলল, "ডাকছিলে মামণি?"

"থার্মোমিটারটা কোথায় রে?"

"তা তো জানি না।"

শমীক বলল, "তোকে জানতে হবে না। রুবি, আমায় এক কাপ গরম চা খাওয়া।"

আশালতা বললেন, "দুধ খা। দুধে শরীর ভাল লাগবে।"

শমীক বলল, "রাত্রে খাব, এখন চা খাই।"

করবী চলে গেল। আশালতা অন্যমনস্কভাবে বিছানার চাদরে হাত বোলাতে লাগলেন, যেন চাদরে কোথায় কী কুটো পড়ে আছে, কুঁচকে আছে—পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল, বললেন, "উঠে বোস না একটু ; বিছানাটা ঝেড়ে দিয়ে যাই, সারাদিন শুয়ে আছিস।"

শমীক মাথা নাড়ল। "ছেড়ে দাও, ঠিক আছে।"

একটু চুপ করে থেকে আশালতা বললেন, "শরীর যদি ভাল লাগে রাত্তিরে তোর বাবার কাছে গিয়ে একটু বসিস। মানুষটা মুখে যত না বলে মনে মনে তত বলে। আর আমিও বুঝি না, তোদের বাপ-বেটায় আজকাল যেন ছেলেমানুষের মতন আড়ি-ঝগড়া চলছে। তুইও তোর বাপের কাছে ঘেঁষবি না, কথা বলবি না ; তোর বাপও গুম হয়ে থাকবে। যত কথা আমায় শুনতে হবে। আমি যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।"

শমীক হেসে বলল, "বাবার সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল।"

"কেন, এতকাল বলিস নি ? এমনভাবে কথা বলেছিস যেন বাপ তোর ইয়ার-বন্ধু।"

"কাকার সঙ্গে বলেছি, বাবার সঙ্গে ঠিক পারতাম না। সরকারী অফিসে অফিসারী করে করে বাবার একটা কমপ্লেক্স তৈরী হয়ে গিয়েছে ; কিছু বললেই ভাবে ভদ্রলোককে যথেষ্ট মান্য করা হচ্ছে না." শমীক হালকা মজার গলায় বলল।

আশালতা ছেলের কাঁধের কাছে আদর করে চাপড় মেরে বললেন, "দেখ শমী, অমন নিন্দে মানুষটার নামে তুই করবি না, তুই তোর বাবার সঙ্গে যেভাবে কথা বলিস এমন ভাবে কেউ কথা বলে না। তোর দাদা বাপ-জ্যাঠার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলে দেখিস না ?"

শমীক চুপ করে থাকল। বাবার সঙ্গে তার যে সহজ, কুণ্ঠাহীন অন্তরঙ্গ সম্পর্কটা ছিল তা কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ? নাকি বাবার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ বেধে উঠেছে বলেই এমন হচ্ছে ?

আশালতা বললেন, "কাল রাত্তিরে তোর বাবা বলছিল, তুই শাসন পাস নি বলেই এত অবাধ্য হয়েছিস, তোকে সকলে তোর খুশিমতন ছেড়ে দিয়েছিল বলেই তোর কোনো উচিত-অনুচিত বোধ হল না। এসব শুনলে কেমন লাগে, বল ?"

শমীক প্রথমে জবাব দিল না, পরে বলল, "বাবা আমায় যতটা চিনেছে আমি বাবাকে তার চেয়ে কম চিনি নি। বাবাকে বোলো। আমিই না-হয় বলব।"

আশালতা বললেন, "থাম তো তুই ; সেদিনকার ছেলে, তুই তোর বাপকে চিনবি ?"

শমীক বলল, "কেন চিনব না কেন ? আর হলামই বা সেদিনকার ছেলে, আমি তোমার শ্বশুরবাড়ির চার পুরুষের ইতিহাস বলে যেতে পারি। শুনবে ?"

"আমার শ্বশুরবাড়ি যে তোর বাপ-ঠাকুরদার বংশ রে ছেলে !"

"হোক বংশ, তবু এই বংশের অহংকার আমার নেই।"

"কী বলিস !···তুই তো কিছু দেখলি না এই বংশের আগেকার মানুষদের। আমার বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছর বয়েসে, তোর দিদি হবার পর শ্বশুরমশাই গত হন। শাশুড়ী গিয়েছিলেন···"

"একটু থামো, আমায় তোমার বিয়ের সাল-তারিখ বলতে হবে না ! তুমি শুধু কত বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, কত ভারি সোনা দিয়ে তোমার শ্বশুর তোমার মুখ দেখেছিলেন—এটা তুমি জানো। ওসব হল বাইরের কথা। ভেতরের কথা তুমি কিছু জানো না, মা। আমার ঠাকুমা—বড় ঠাকুমা কী করে মারা গিয়েছিল তুমি জানো ?"

আশালতা ধারণাও করতে পারেন নি এমন কথা উঠতে পারে। থতমত খেয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

শমীক বলল, "তোমার শ্বশুরমশাই তার প্রথম স্ত্রীকে তিলে তিলে মেরেছে।"

আশালতা যেন হাত বাড়িয়ে শমীকের মুখ চাপা দেবার চেষ্টা

করলেন। কেমন শঙ্কিত হয়ে বললেন, "চুপ, চুপ ও-কথা বলিস না। এ বাড়িতে তোর ঠাকুমাকে কেউ চেনে না, জানে না; শুধু নামেই শুনেছে। তোর বাবাও নিজের মাকে বুঝতে পারার আগেই তিনি চলে গেছেন।"

"না গিয়ে আর কী করবে! তোমার শ্বশুর তো রাত তিনটেয় ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি ফিরত রোজ, আমোদ সেরে; আর ষোলো-সতেরো বছরের অমন লক্ষ্মীর মত বউ জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকত স্বামীর প্রতীক্ষায়। এর পরও মানুষ বাঁচে?"

আশালতার গা কেঁপে গেল। এসব কথা কোনোদিন কেউ আলোচনা করে নি। কারুর জানার কথা নয়। স্বামীর কাছে অল্পস্বল্প শুনেছেন তিনি; কিন্তু দেবপ্রসাদও নিজের শিশু বয়েসের কতটুকু জানেন! পরে দু-চার কথা যা কানে এসেছে হয়ত সেটাই মনে রেখেছেন। নিজের মার জন্যে দুঃখ কার না থাকে, দেবপ্রসাদেরও ছিল, অন্তরের কোথায় যে তাও হয়ত তিনি জানতেন না। কিন্তু, শমী এসব কথা কোথা থেকে জানল? কে তাকে বলল?

অদ্ভুত এক আতঙ্ক ও বিস্ময় নিয়ে আশালতা ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

দশ

অমৃতর বিয়ে হয়ে গেল। কোথাও কোনো বিঘ্ন ঘটল না। এমনকি বিয়ের আগে আগে অসময়ের বৃষ্টি সামান্য ভয় দেখিয়েছিল, শীতের মধ্যে মেঘলা গেল, এক পশলা বৃষ্টিও হল একদিন, শেষ পর্যন্ত মেঘবৃষ্টি হাওয়ায় উড়ে গিয়ে আকাশটা ঝলমলে হয়ে উঠল। চমৎকার দিনে বিয়ে হল অমৃতর, বউভাতও যেমনটি চাওয়া হয়েছিল সেই ভাবে শেষ হল। উৎসবের এই আয়োজন চলছিল অনেক দিন

ধরে, শেষ হবার পর সব আয়োজন অনেক দ্রুত ভেঙে যেতে লাগল। ছাদের মেরাপ খোলা হয়ে গেল, আলোর সাজ বাড়ির গা থেকে সরে গেল, অজস্র শাড়ি জামা ধুতি তোয়ালে ঝুলত বারান্দার গায়ে, তাও একে একে উঠে গেল। অমৃত দ্বিরাগমন করতে শ্বশুরবাড়ি যাবার পর বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল।

দেবপ্রসাদ এই বয়েসে দীর্ঘ দিনের একটা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ সহ্য করার পর এখন সমস্ত দায়িত্বমুক্ত হয়ে স্বস্তি অনুভব করছিলেন। চারুপ্রসাদও খুশী। তাঁরও অনেক দুর্ভাবনা ছিল, সেই চিন্তা থেকে মুক্তি। বাড়িতে এতদিন পরে একটা আলস্য ও অবসাদের ভাব এসেছে, সমস্ত কলরব শান্ত হয়ে আবার সেই পুরোনো সুস্থির ভাবটা ফুটে উঠছিল। সমস্ত সংসার যেন খুশী, তৃপ্ত, দায়িত্বমুক্ত।

এমন একদিনে দেবপ্রসাদ সন্ধেবেলায় তাঁর ঘরের বারান্দায় চায়ের আসর বসিয়ে দিলেন। অমৃত আর তার নতুন বউ আলিপুরে দ্বিরাগমনে গিয়েছে।

আসরে দেবপ্রসাদ চারুপ্রসাদ দুজনেই ছিলেন আশালতাও বসে ছিলেন এক পাশে। ইন্দুলেখা এসব জায়গায় থাকতে সঙ্কোচ বোধ করেন। আশালতা তাকেও কাছাকাছি রেখেছেন। করবী দেবপ্রসাদের পাশে মোড়ায় বসে ছিল।

শমীকের ডাক পড়েছিল। সেও এল।

বিয়ের গল্পের জের কেটে যাবার পর দেবপ্রসাদ ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আমার এবার হাত গুটোনোর সময়, সংসার থেকে আমি ছুটি নিলুম। এখন থেকে চারু…।"

শমীক বুঝতে পারল, বাবার আজ মনটন খুব ভাল। খুশীতে এবং তৃপ্তিতে বাবার চোখমুখ ভরে আছে।

আশালতা হেসে বললেন, "মুখে বলছ ছুটি, দেখি সত্যিই নিতে পার কিনা!"

দেবপ্রসাদ বললেন, "মুখে বলছি না, সত্যি কথাই

বলছি। তোমাদের এই সংসারের জোয়াল অনেকদিন বয়েছি। আর কেন?"

ইন্দুলেখা ভাশুরের সামনে গলা তুলে কথা বলেন না, ফিসফিস করে আশালতাকেই বললেন, "এখনও ছুটো পড়ে থাকল দিদি।"

কথাটা দেবপ্রসাদ শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন, "ছুটো কেন? একটা।" বলে স্নেহের চোখে করবীর দিকে তাকিয়ে তার মাথায় হাত রাখলেন, "এটাকে তোমরা ধোপার বাড়িতে বিয়ে দিও। ও তো দেখছি বরাবর তোমাদের ধোপার বাড়ির হিসেব লিখেই কাটাল।"

চারুপ্রসাদ আশালতা ইন্দুলেখা সকলেই হেসে উঠলেন জোরে। করবীও হাসল। জ্যেঠার হাত টেনে নিয়ে বলল, "ইস!"

দেবপ্রসাদ এবার ছেলের দিকে তাকালেন; বললেন, "আর ওই যে আর-একটি তার সম্পর্কে আমার কিছু করার নেই। যা করার তোমরা কোরো। ও যদি মানুষ হয় তোমাদের জন্যেই হবে। আমায় ও ওল্ড জেণ্টলম্যান হিসেবে বাতিল করে দিয়েছে।"

শমীক বাবার কথায় হেসে বলল, "তোমায় বলছ কেন, তোমাদের সকলকেই।"

"সকলকেই?" দেবপ্রসাদ যেন কৌতুক করেই বললেন।

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা!"

"আচ্ছা নয়, সত্যি সত্যি।" শমীক একবার কাকার দিকে তাকাল। অথচ দেবপ্রসাদকেই উদ্দেশ করে বলল, "তোমাদের সঙ্গে আমার বনবে না।"

"কী করে বনবে বলো," দেবপ্রসাদ ঠাট্টা করেই বললেন, "তুমি তো প্রেজেণ্ট জেনারেসান। আমাদের সঙ্গে তোমাদের শুনেছি বনে না। অথচ দেখো, তোমার দাদার সঙ্গে বনলো।"

শমীক হাত বাড়িয়ে চায়ের পটটা টেনে নিল। আর এক কাপ চা ঢেলে নেবে। বলল, "দাদার কথা আলাদা।"

"কেন ? সেও তো এ-বাড়ির ছেলে। তোমার মতন সেও মানুষ হয়েছে একই জায়গায়, একই ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনে।"

"হয়েছে। কিন্তু দাদা মানুষ হয়েছে তোমাদের ধারণা মতন, তোমরা যাকে মানুষ বলো। আমি হই নি।"

"তুমি অমানুষ হয়েছ ?"

চায়েব কাপ ভরতি করে শমীক পটটা রেখে দিল। চিনি তুলল চামচে করে। নীচু মুখেই বলল, "বাবা তুমি যদি রাগ না করো - ক'টা কথা বলব।" বলে মুখ তুলে কাকার দিকে তাকাল, বলল. "কাকা, তুমি কাছেই রয়েছ, আমি সকলের সামনেই কথাগুলো বলতে চাই। একদিন-না-একদিন বলতাম। খুব শীঘ্র। আজই বলে ফেলা ভাল।"

আশালতা বাধা দিয়ে বললেন, "রাখ তোর কথা। যত গালভরা কথা শিখেছিস।"

দেবপ্রসাদ বললেন, "আহা, বলুক না। ওর কথায় আমাদের গায়ে ফোস্কা পড়বে না। কী ও বলতে পারে। তা ছাড়া ও ছেলে-মানুষ নয়। বলার অধিকার ওর আছে।"

শমীক চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল। মাকে দেখল। তারপর চারুপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকা, আমি তোমায় একদিন বলেছিলাম—আমি একটা মামলা লড়ব। আমি জানতাম এই মামলায় তুমি আমার পক্ষ নেবে না। তোমায় বলেছিলাম, বেশ—তুমি তাহলে ডিফেণ্ড করো।"

দেবপ্রসাদ বললেন, 'কিসের মামলা ?"

"তোমাদের এগেনসটে," শমীক বলল, "তোমাদের ফ্যামিলি, তোমাদের ট্র্যাডিশন, তোমাদের এই অহংকার, গর্ব, খুশী-খুশী ভাব—সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আমার মামলা।"

চারুপ্রসাদ ভাইপোকে থামিয়ে দেবার মতন করে করে বললেন, "এখানে জজসাহেব নেই রে, জজ ছাড়া মামলার হিয়ারিং হয় না।"

শমীক বলল, "কে বলল জজসাহেব নেই। তোমরাই জজগিরি করতে পার। শত হলেও বিবেক আছে; বোধ আছে। নেই?"

ইন্দুলেখা অস্বস্তি বোধ করে উঠতে যাচ্ছিলেন, শমীক চোখের ইশারায় বারণ করল, বলল, "বোস না, তোমার শ্বশুরবাড়ির ট্র্যাডিশনটা শুনে যাও।"

দেবপ্রসাদ প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি জল এ-রকম একটা দিকে গড়িয়ে যাবে। এখন তিনি পিছিয়ে যেতে পারলেন না। তা ছাড়া তাঁর হঠাৎ কেমন একটা জেদ চাপল। শমী যে কথায় কথায় তাঁদের বংশ, পরিবার, শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে কথা বলে, ঠাট্টা করে, এ তিনি জানেন, নিজের কানেও শুনেছেন। এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা যায় না। এই স্পর্ধার তিনি জবাব দেবেন।

দেবপ্রসাদ বললেন, "আমাদের বিরুদ্ধে তোমার কী বলার আছে শুনি?"

"আমি কিন্তু খুব পরিষ্কার হব।"

"হও।"

"তোমরা লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে।"

"তুমিও লজ্জা পেতে পার। আর দুঃখ তুমি আমাদের নতুন করে কী দিতে পার? বরং যা পাচ্ছি তার বেশী নাও পেতে পারি।"

শমীক দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "বাবা, তুমি নিজেই একটু আগে জেনারেসানের কথা তুলেছ। তোমার কি কখনও মনে হয় না, এই জেনারেসানের জন্যে তোমরা দায়ী?"

দেবপ্রসাদ মাথা নাড়লেন। "না, আমার মনে হয় না। তোমায় আমরা এমনভাবে মানুষ করি নি যাতে তুমি এ-কথা বলতে পার।"

"শুধু যদি আমার কথা ধরো আমি নিশ্চয় কোনো কোনো ব্যাপারে ক্ষমা চাইব, কিন্তু শুধু আমার কথা ধ'রো না। একজনকে দিয়ে একটা জেনারেসান হয় না।"

"আমি অন্যের কথা কেন শুনব? তোমার কথা শুনতে পারি।"

শমীক বিদ্রূপ করে বলল, "এই তো তোমাদের স্বার্থপরতা।"

"স্বার্থপরতা ?"

"স্বার্থপরতা ছাড়া কী। নিজের ছাড়া পরের জন্যে তোমরা মাথা ঘামাতে রাজী নও। তোমাদের বংশে এই জিনিসটা কত বেশী তা একবার ভেবে দেখেছ ?"

দেবপ্রসাদ যেন বেশ অবাক হলেন। ভাইয়ের দিকে তাকালেন, তারপর স্ত্রীর দিকে। তাঁরা স্বার্থপর এ-কথা শমীক কেমন করে বলল ?

চারুপ্রসাদ বললেন, "আমাদের বংশে তুই এত স্বার্থপরতা কোথায় দেখলি ?"

"কেন, তোমার বাবাকে দেখলাম। তোমাদের বাবার বাবা ছিল চোর, লোভী, দু'কান-কাটা। লোকটা এসেছিল ধুতি-চাদর পরে কলকাতায়, তার বউ গায়ে জামা পরত না, সেমিজ..."

আশালতা ধমক দিয়ে বললেন, "আ, শমী; কী হচ্ছে। গুরুজনদের নিয়ে তামাশা!"

শমীক বলল, "তামাশা নয়, সত্যি। একটা লোক কোন গ্রামট্রাম থেকে এসে কলকাতায় জুটল, দুটো খেতে-পরতে পারবে বলে। একটা পেশকারী জুটে গেল বরাতে। তখনকার দিনে কোর্ট-কাছারি ছিল টাকার জায়গা। লোকে বলত, উকিল পেশকার মুহুরী—টাকা জমায় কাঁড়ি কাঁড়ি। সাড়ে চার টাকার বাসাবাড়ি ভাড়া করে যে জীবন শুরু করেছিল সেই লোক পেশকারী করে এই কলকাতায় বাড়ি করে ফেলল—আরে ব্বাস, লোকটাকে চোর না বলে বলা উচিত ডাকাত।"

দেবপ্রসাদের মুখ আরক্ত হল। চারুপ্রসাদ বিব্রত বোধ করছিলেন। করবীর হাসি পেয়ে গিয়েছিল; ছোড়দা এমন ভাবে 'ডাকাত' কথাটা বলল যে না হেসে সে পারল না। চারুপ্রসাদ এবং আশালতা সেটা লক্ষ করলেন।

চারুপ্রসাদ ভাইপোকে বললেন, "তোর একটা মস্ত দোষ হয়েছে, যা দেখছিস সবই বেঁকা করে। এত খবরই বা কোথা থেকে পেলি তুই ?"

শমীক বলল, "বাঃ, তোমরা যখন তোমাদের বাপ-ঠাকুরদার কথা বলবে তখন শুধু গুণের দিকটাই বলবে, দোষের ধারে-কাছে ঘেঁষবে না। আর আমি যদি নিন্দের কথা বলি তখন বলবে বেঁকা করে দেখছিস।"

দেবপ্রসাদ বললেন, "তোমায় আমাদের ঠাকুরদার কথা কে বলেছে ?"

"কে আবার বলবে! তোমরাই কত সময় গল্প করেছ, তা ছাড়া তোমাদের বাবা পয়সা খরচ করে এক মোসাহেবকে দিয়ে একটা চটি বই লিখিয়েছিল। সেই বইয়ে তুমি দেখতে পাবে।"

"বই ? কিসের বই ?"

"বইটা থার্ড ক্লাস। তোমাদের ঠাকুরদার নিশ্চয় কোনো শত্রু ছিল। কী-একটা কাগজে সে লোকটা তোমাদের ঠাকুরদার হিঁদুয়ানি আর কায়স্থ সমাজের শিরোমণি হবার চেষ্টা দেখে তেড়ে গালাগালি দিয়েছিল, তার জবাবে তোমাদের বাবা একটা বই ছাপিয়ে চারিদিকে বিলি করেছিল। তার মধ্যেই তোমাদের ঠাকুরদার জীবনের অধ্যবসায় ও কীর্তির কথা আছে, কিন্তু আসল কথাটা নেই, পালটা গালাগালটাই বেশী আছে।"

দেবপ্রসাদ বোকার মতন ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন। এ-রকম কোনো বইয়ের কথা তিনি শোনেন নি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না।

চারুপ্রসাদ বললেন, "কোথায় পেলি তুই বইটা ?"

"নীচের ঘরে পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে।"

করবী হঠাৎ বলল, "সেই—সেই বইটা ছোড়দা ? তোর বিছানায় ছিল ?"

শমীক মাথা নাড়ল।

দেবপ্রসাদ যেন ব্যাপারটাকে নিয়ে আর এগুতে চাইলেন না। ঠাকুরদার সম্পর্কে তিনি নিজেও বিশেষ কিছু জানেন না। যেটুকু শুনেছেন তাও মুখে মুখে।

আশালতা ছেলেকে বললেন, "এবার তুই থাম। যাঁরা নেই, তাঁদের নামে নিন্দে করা পাপ। আমরা তাঁদের ছেলে বউ নাতি-নাতনী, পূর্বপুরুষের নিন্দে করে আমাদের গৌরব বাড়বে না।"

শমীক চা শেষ করে কাপটা রেখে দিল। বলল, "গৌরবের কিছু থাকলে নিশ্চয় গৌরব বোধ করব, না থাকলে করব কেন? তোমার শ্বশুরমশাই স্বর্গেই থাকুক আর যেখানেই থাকুক ভদ্রলোক যে নিজের বাবাকেও সব দিক দিয়ে হার মানিয়েছিল তাও আমি বলব।"

ইন্দুলেখা আর বসে থাকতে পারলেন না। ভাশুর, বড় ভাজ, মেয়ের সামনে বসে এসব কথা শুনতে তাঁর লজ্জা করছিল। তিনি উঠে পড়ে কাজের ছুতো দেখিয়ে চলে গেলেন। চোখের ইশারায় মেয়েকেও ডাকলেন। করবী তাকাল না।

দেবপ্রসাদ রুক্ষ গলায় বললেন, "আমাদের বাবাকেও কি তুমি চোর-ডাকাতদের দলে ফেলতে চাও?"

শমীক বলল, "তোমাদের ঠাকুরদার তবু একটা গুণ ছিল। সে বেচারী ছিল গ্রাম্য, গোঁড়া, শহুরে বাবু হবার ইচ্ছে তার ছিল না, আর মারাও যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু তোমাদের বাবা ছিল মোর অ্যামবিসাস, রেসপেক্টেবিলিটির জন্যে মত্ত। ঈশ্বরদাস ছিল যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি চালাক। যত স্বার্থপর, তত লোভী। ধূর্ত, ফন্দিবাজ। প্রতিষ্ঠার জন্যে যত রকম ধূর্তমি করতে হয়—সব করতে পারত।"

আশালতা অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "তোর মুখের কোনো বাঁধন নেই। তুই যদি চুপ না করিস আমি উঠে যাব।"

শমীক বলল, "উঠে গিয়ে তোমার শ্বশুরের সম্মান বাঁচাতে চাও

বাঁচাও। কিন্তু তুমি নিজেই জান তোমার শ্বশুর কেমন মানুষ ছিল। তোমার বাবা এ-বাড়িতে মেয়ে দিতেও চায় নি প্রথমে। কেন?"

দেবপ্রসাদ কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অনেক কালের কথা, তবু নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে গেল। বাবার কিছু কিছু দুর্নাম, বিশেষ করে মদ্যপান এবং অন্যান্য চরিত্রঘটিত ব্যাপারের দুর্নামের জন্য আশালতাদের বাড়ি থেকে বিয়ের প্রস্তাবটা ভেঙে যেতে বসেছিল তা তিনি জানেন। তাছাড়া, তিনি মাতৃহীন, বিমাতা সংসারের কর্ত্রী। আপত্তি করার সংগত কারণ ছিল।

আশালতা অপলক চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ-কথা তোকে কে বলল?"

"মামার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।"

"দাদা বলেছে?"

"মামাকে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিয়েছি," শমীক যেন নিতান্ত দুঃখেও হাসবার চেষ্টা করল, "তোমাদের অমন নামকরা, সম্ভ্রান্ত, স্বদেশী-করা বাড়ির মেয়ে কী করে মদের ব্যাবসাদার ঈশ্বরদাসের বাড়ির বউ হয়ে এল—এটা খুব ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার। মামা কি আর বলতে চায়, কিন্তু আমার কাছে ঈশ্বরদাসের বন্ধু কাউন্সিলার বলরামবাবুর একটা চিঠি ছিল। মামা ধরা পড়ে গেল।"

দেবপ্রসাদ, চারুপ্রসাদ, আশালতা—তিন জনেই যেন কেমন নির্বাক হয়ে শমীককে দেখতে লাগলেন।

দেবপ্রসাদ বলরামকাকাকে বিলক্ষণ জানতেন। বাবার বন্ধু শুধু নয়, পরামর্শদাতা। বলরামকাকার জন্যে বাবাকে বিস্তর পয়সা খরচা করতে হত, অবশ্য তার বদলে বাবা বলরামকাকার দৌলতে অজস্র অর্থও রোজগার করেছেন। দেবপ্রসাদের এ-কথাও মনে পড়ল।

মা—মানে মনোরমা—একবার বলরামকাকার স্ত্রীর মুখে উনুনের

ছাই মাখিয়ে দিয়েছিল। মা ছিল পাগল। কিন্তু মা বুঝত, কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যায়।

আশালতারও মনে পড়ল। তাঁর বিয়ের আগে বলরামবাবু কেমন করে বাবার কাছে আসা-যাওয়া করতেন।

চারুপ্রসাদ জীবনে যে দু-একটি মানুষকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন তার একজন বলরামবাবু। বাবার বন্ধু হলেও ওই মানুষটির অনাচার তাঁদের অজানা ছিল না।

শমীক হঠাৎ হেসে বলল, "মামা কিন্তু বলেছে মা, তোমাদের বাড়িতে বাবাকে খুব পছন্দ হয়েছিল। বাবা রূপে গুণে ব্রিলিয়ান্ট ছিল।"

দেবপ্রসাদ একবার ছেলের দিকে তাকালেন।

আশালতা লজ্জা পেলেন না। বোধ হয় লজ্জা পাবার সময় ওটা নয়। তাঁর অন্য ভয় হচ্ছিল। করবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই যা—বড়দের কথায় বসে থাকতে হবে না।"

করবী উঠে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে গেছে। শীতের ঠাণ্ডা গায়ে লাগছিল। বারান্দার বাতি জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন ইন্দুলেখা। আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

চারুপ্রসাদ বললেন, "শমী, বাবা যে বুদ্ধিমান ছিলেন, পয়সা চিনতেন, একরোখা ছিলেন—এ-সবই স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু তিনি যা করেছেন তা কি নিজের জন্যে না আমাদের জন্যে। এই বাড়ির যা-কিছু তিনিই করে গেছেন। তাঁর দোষ দেখাটাই বড় কথা নয়। গুণটাও দেখা উচিত।"

শমীক ঠাট্টা করে বলল, "কাকা, আমি কতকগুলো কথা তোমাদের সামনে মুখে আনব না। সে শুধু এই জন্যে যে, তোমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আমি অসভ্যতা করব না, কেননা তোমরা এ-বাড়িতে কোনো অসভ্যতা করো নি। কিন্তু তোমাদের বাবা—

পয়সার বেলায়, বাড়ি সাজাবার বেলায়, বড় ছেলের বিয়েতে সম্ভ্রান্ত হবার বেলায় যে মান ইজ্জত রুচির খেলা দেখিয়েছে, নিজের জীবনে সেটা দেখায় নি। অনেক পাপ তোমাদের বাবা করেছে।"

দেবপ্রসাদ যেন সতর্ক চোখে স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন।

শমীক বলল, "দেখো কাকা, আমি ভেবে দেখেছি, তোমাদের পিতৃভক্তিটা খাঁটি নয়। তোমরা তোমাদের পিতৃদেবকে তেমন একটা ভক্তিশ্রদ্ধা করতে না। ভদ্রলোক অথরিটি হিসেবে তোমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়েছিল, আর তোমরা দুই ভাই সেই অথরিটিকে মান্য করে গেছ। তোমরা কখনও প্রশ্ন করো নি, বিরুদ্ধে যাবার সাহস করো নি। কেন করো নি? তোমাদের সে-চরিত্র ছিল না। বাপ যখন এমন একটা বাড়ি জাঁকিয়ে রেখে যায়, ব্যাংকে টাকা আর কোম্পানীর কাগজ রাখে, অমুকতমুকের শেয়ার কিনে চারদিক বেশ গুছিয়ে দিয়ে যায় তখন কেন আর অন্যদিকে মাথা ঘামানো। আসলে তোমরা জীবনে বারবার ঝঞ্ঝাটকে এড়িয়ে থাকাটাকেই বড় মনে করেছ। অর্থাৎ তোমরা ছিলে ভীরু, গা-বাঁচানো লোক। তোমাদের বাপঠাকুরদার মতনই স্বার্থপর। ভীষণ স্বার্থপর।"

আশালতার বুকের মধ্যে কেমন করছিল। একেই তাঁর বুকের অসুখ, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট আছে। বিয়ের কটা দিনের খাটাখাটুনিতে এমনিতেই শরীর ভাল যাচ্ছিল না—তার ওপর এখন যা হয়ে উঠছে এতে যেন বুকের উপর পাথর চেপে বসছিল। স্বামীর মুখ দেখছিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল। দেবপ্রসাদ শান্ত মানুষ, কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বকে কখনওকখনও কঠিনভাবে অনুভব করা যায়। আশালতা স্বামীর চোখেমুখে সেই রকম এক কাঠিন্য দেখছিলেন। চারুপ্রসাদও যে প্রচণ্ড অস্বস্তি ও লজ্জার মধ্যে পড়েছেন তাও বোঝা যাচ্ছিল।

আশালতা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত মুখে বললেন, "আমরা সকলেই যদি স্বার্থপর তাহলে তোরা কী?"

শমীক মার কথায় কান দিল না। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, তুমি নিশ্চয় রাগ করবে, কিন্তু সত্যি করে বলো তো—তোমার মার জন্যে তুমি ওই ঈশ্বরদাসের ওপর কি খুব খুশী ছিলে? তোমার বাবার কি সত্যি সত্যিই মানুষের কোনো গুণ ছিল?"

দেবপ্রসাদ যেন পাথরের মতন প্রাণহীন হয়ে অদ্ভুত এক চোখ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর মুখে না বেদনা, না বিস্ময়, না যন্ত্রণা অথবা ক্রোধ। সব যেন মিলেমিশে কেমন ভাবহীন এক ভঙ্গি ফুটে থাকল।

চারুপ্রসাদ সবল মানুষ। তাঁর সমস্ত মুখ্ ম্লান হয়ে গেল।

আশালতা কপালে হাত তুললেন।

সকলেই যখন নীরব—শমীক কাকার দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকা, আমি কিন্তু তোমার মাকে দোষ দিচ্ছি না। বরং তোমার মা—যতটা পাগল হয়েছিল—তার চেয়ে বেশী পাগলই হবার কথা। একমাত্র ছোট ঠাকুমাকেই দেখলাম তোমাদের বাবাকে মাঝে মাঝে জব্দ করতে পেরেছিল। তোমরা তিন ভাইবোন না থাকলে ঠাকুমা হয়ত গলায় দড়ি দিত, না-হয় আগুনে পুড়ে মরত। তোমাদের বাবার জন্যে তোমরা বাঁচো নি, বেঁচেছ মায়ের জন্যে।

চারুপ্রসাদ বারান্দার থামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। শীতে জুঁই গাছে পাতা ঝরে গিয়ে থামের গায়ে ডালগুলো জড়ানো। অল্প কিছু পাতা। অন্ধকার আলসের ওপর থম্ মেরে যেন দাঁড়িয়ে আছে। একটা মাত্র বাতি জ্বলছে বারান্দার এপাশে। শীত বেড়ে উঠছে। বাড়িটা বড় ফাঁকা লাগছিল। যেন সব শূন্য হয়ে গেছে।

দেবপ্রসাদ এতক্ষণে বুঝি নিজেকে খানিকটা সামলে নিতে পেরেছেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোনো, আমার অনেক বয়েস হয়েছে। জীবনের সমস্ত শিক্ষা তুমি একলাই পাও নি। আমরাও পেয়েছি। রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, জব্দ করার মন নিয়ে বেঁচে থাকলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। আমাদের বাবা কী

করেছেন, তাঁর কত দোষ ছিল, অপরাধ ছিল—যদি এই সব ভেবেই আমরা জীবন কাটাতাম তা হলে—তা হলে আজ এ সংসার টিকে থাকত না? তুমি অন্ধ নও। তোমার কি মনে হয় নি—যা খারাপ, মন্দ, মনকে বিষিয়ে দেয় আমরা তার বাইরে এসে জীবন কাটালাম?"

মাথা নেড়ে শমীক বলল, "আমি একশোবার তোমাদের বাহবা দেব। বলব আজকের দিনে এটা দেখা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলব, তোমরা মন্দটাকে সরিয়ে রেখে শুধু নিজেদেরই বাঁচাবার চেষ্টা করেছ। নিজেদের দিকটাই দেখেছ।"

"কেন? তোমাদের দিক দেখি নি? তোমাদের ভাইবোনদের কার দিকে দেখি নি?"

শমীক একবার কাকার দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল, 'তোমরা পুরবীর দিকে দেখো নি। তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছ।"

চারুপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ দুজনেই কেমন চমকে উঠে শমীকের দিকে তাকালেন। আশালতা কপালে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন।

দেবপ্রসাদ বললেন, "কী বলছ তুমি?"

শমীক বলল, "আমি যা বলছি তা তোমরা একটু-আধটু জান। মৃগাঙ্ক বলে একটি ছেলের সঙ্গে পুরবীর ভাব ছিল। পুরবীর খুব ইচ্ছে ছিল তোমরা তার সঙ্গে ওর বিয়ে দাও। ছেলেটি ভাল, কিন্তু সামান্য একটি চাকরি করত, একেবারে গরিব পরিবারের ছেলে বলে তোমরা এ-ব্যাপারে মাথাই ঘামালে না। পুরবীকে চোখে চোখে রাখলে, বাড়িতে আটকে আটকে রাখলে। তারপর যার সঙ্গে বিয়ে দিলে সে বাপের খাতিরে একটা বিজনেস হাউসে জুনিআর অফিসার।"

আশালতা কপাল থেকে হাত সরিয়ে আবার সোজা হয়ে বসেছিলেন। ঝাঁঝালো গলায় বললেন, "তুই কোথাকার কোন

অজানা অচেনা ছেলের হয়ে মুরুব্বিগিরি করতে এসেছিস ? এ-বাড়িতে ও-রকম বিয়ে হয় না। মেয়ের পছন্দই কি সব ?"

শমীক বলল, "তোমাদের পছন্দে আমাদের জীবন কাটাতে হবে ?"

"আমরা কি তোদের মন্দ করেছি ?"

"মা, তুমি কিছু জানো না। পুরবীকে তোমরা আগেও বোঝ নি, এখনও বুঝতে চাও না। দেখো না, সে এ-বাড়িতে কত কম আসে, এলেও বেশীক্ষণ থাকতে চায় না !"

"তার মানে ?"

"মানে এই যে—সে এ-বাড়ির ব্যাপারে খুশী নয়। তা ছাড়া তার বর বোধ হয় কিছু আন্দাজ করে।"

চারুপ্রসাদ শমীককে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এই ছেলেটার কথা আমি শুনেছি। সে তো পলিটিকস্ করত, পুলিস তাকে ধরেছে শুনেছিলাম। এই ধরনের ছেলের সঙ্গে কোন বাপ-মা মেয়ের বিয়ে দিতে চায় ?"

"বেশ বললে তুমি, কাকা," শমীক ব্যঙ্গ করে বলল, "মৃগাঙ্ক পলিটিকস্ করে বলে অপাত্র, আর তোমাদের মেজ জামাইয়ের বাবা যে ওই পলিটিকস্ করেই নেতা হয়ে এক সময় হাফ্-মন্ত্রী হয়েছিল তাতে কোনো দোষ হল না ? আসলে পলিটিকস্ করাটা কোনো ব্যাপার নয়, দেখতে হবে কোন্ দলের পলিটিকস্ করছে ? যদি দেখো যে পলিটিকস্ করায় সুবিধে তা হলে হাত বাড়াও, যদি বোঝ ঝুঁকি আছে—তবে হাত সরিয়ে নাও। যাক্‌গে, মৃগাঙ্ক বড় সাধারণ ছিল বলে তোমরা তাকে পাত্তা দাও নি।...ভাল কথা, মৃগাঙ্ককে আমি সেদিন ট্রামে দেখেছি। জেলে সে নেই। হয় ধরা পড়ে নি। না-হয় জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে।"

চারুপ্রসাদ কথা বলতে পারলেন না। চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সংসারের এ-সব দিকে নজর না রাখলেও তিনি স্ত্রীর কাছে

শুনেছিলেন। পুরবী বিয়ের আগে অনেক চোখের জল এ-বাড়িতে ফেলে গেছে। কিন্তু আজ কেন শমী এ-কথা বলছে? যদি সে বুঝেইছিল এত বড় অন্যায় ঘটে যাচ্ছে তার বোনের ভাগ্য নিয়ে, তখন কেন মাথা তুলে দাঁড়ায় নি?

কথাটা মনে এলেও চারুপ্রসাদ দাদা-বউদির সামনে তা বলতে ভরসা পেলেন না। কেননা, পুরবীর বিয়ের ব্যাপারেও দাদা ছিল কর্তা।

আশালতাও আর বসে থাকতে পারলেন না। তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। কেমন যেন অসুস্থ হয়ে এক ঘোরের মধ্যে বারান্দা ছেড়ে চলে গেলেন।

দেবপ্রসাদ নিজের ভেঙে-পড়া অবস্থাটা আশ্চর্যভাবে সামলে নিলেন। মনে হল, ছেলের হাত থেকে কিছু বাঁচাবার জন্যে যেন তিনি কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। দেবপ্রসাদ বললেন, "অল্প বয়েসের এই সব মাথাগরম ভাবনা একদিন যখন কেটে যাবে তখন দেখবে আমরা খুব কিছু অন্যায় করি নি। তোমাদের সবচেয়ে বড দোষ হল, তোমরা মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু ভাবতে শেখো নি, ভবিষ্যৎ তোমরা ভাবতে পার না।"

শমীক তার দু হাত উঠিয়ে ঘাড়ের পেছনে রাখল। রেখে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে থাকতে থাকতে বলল, "তোমরাই কি পেরেছিলে?"

"আমরা তোমাদের মতন ছিলাম না। আমরা আর তোমরা—? তফাত তো দেখতেই পাচ্ছ।"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি। তোমরা নিজেদের ঠকিয়েছ, তোমরা যা উচিত ছিল তা করো নি। মনে মনে বুঝেছ কোন্‌টা অন্যায় আর কোন্‌টা ন্যায়। তবু শেষ পর্যন্ত নিজেদের সুবিধের জন্যে অন্যায়টা মেনে নিয়েছ। তোমাদের যুগটা অদ্ভুত, জোড়াতালি মারা, স্বার্থপরের যুগ। তোমরা যতই মর‍্যালিটি, ডিসিপ্লিন, অনেস্টি, স্যাক্রিফাইসের

কথা বলো না কেন আমি তা বিশ্বাস করব না। পচা খেজুরের ওপর রঙীন কাগজের মোড়কের মতন তোমরা চটকদার ছিলে। তুমি যতই বলো বাবা, আমি কোনোদিন বলব না—তোমরা উঁচু দরের মানুষ ছিলে। নিজেরটুকু বাঁচিয়ে রাখার, আগলে রাখার, বিপদ থেকে সরে থাকার চেষ্টাই তোমরা করেছ। তোমরা ঝুঁকি নিতে চাও নি, পাকাপাকি ভাবে কিছু গড়তে চাও নি। সে-ক্ষমতা তোমাদের ছিল না। তোমরাই সব চেয়ে বড় দায়িত্বহীন।"

দেবপ্রসাদের পক্ষে আর যেন সহ্য করা সম্ভব হল না, বললেন, "আমরা যদি স্বার্থপর, ভীতু, দায়িত্বহীন হতাম—তা হলে আজ তোমরা কোথায় থাকতে?"

"যেখানে তোমরা রাখতে চেয়েছ—সেখানেই আছি।" শমীক ম্লান করে হাসল। বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "আমরা কোথায় আছি দেখছ না! তোমরা আমাদের জন্যে অনেক ভেবেছিলে কিনা, তাই আজ আমরা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি।"

চারুপ্রসাদ বললেন, "শমী, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপালে নিজের কোনো দায়িত্ব থাকে না। আমাদের যদি দোষ থেকে থাকে সেটা থাকল, কিন্তু তোমরা কী নির্দোষ?"

শমীক মাথা নেড়ে বলল, "না কাকা, আমরা নির্দোষ নই। আমরা যে কেমন হয়ে গিয়েছি তা তোমরাও দেখতে পাচ্ছ।"

"তা হলে?"

"তোমার এই তা হলের কোনো জবাব আমার জানা নেই। তোমরা তোমাদের দিন শেষ করে আনলে, আমরা যে কী করব কে জানে!"

দেবপ্রসাদ নীরব। চারুপ্রসাদও কথা বললেন না। শমীকও সাড়া দিল না।

এগারো

কয়েকটা দিন অনবরত ডাকাডাকি করে মৃদুলা শমীককে ধরতে পারল। তারপর দেখা হল দুজনে।

মৃদুলা বলল, "তোর ব্যাপারটা কী? ডুমুরের ফুল হয়ে গিয়েছিস?"

"আমার ব্যাপার থাক্, তোর ব্যাপারটা বল।"

"আমার ব্যাপার খুব খারাপ। মার্চ মাসে অফিস উঠে যাচ্ছে। জন চার-পাঁচ থাকবে এখানে। বাকিরা হয় ছাঁটাই না-হয় কাউকে কাউকে বম্বে পাঠিয়ে দিচ্ছে।"

"তোকে কী করেছে?"

"বলেছে বম্বে যেতে।"

"চলে যা—।"

"কী বলছিস তুই? বাড়িতে বাবা আর মা। দুজনেরই বয়েস হয়েছে। দাদা-বউদি জয়পুরে। আমি যাব বম্বে? কত টাকা মাইনে পাই জানিস? এই টাকায় বম্বে গিয়ে থাকা যায় না।"

"তা হলে ছাঁটাই হয়ে যা।"

"তারপর?"

"বাড়িতে বসে থাক। খা আর ঘুমো। সিনেমা দেখ। ওজন বাড়া। তারপর একটা বিয়ে-থা করে ফেল।"

মৃদুলা শমীকের হাতে খোঁচা মেরে বলল, "তোর অ্যাডভাইসটা খামে মুড়ে রেখে দে। পরে দরকার পড়লে নেব।"

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে মনুমেণ্টের দিকে চলে গেল। বাতাসে শীতের সঙ্গে সামান্য যেন উষ্ণতাও রয়েছে।

মাঠে এসে বসল দুজনে। এখনও বেলা মরে যায় নি। মাঝে মাঝে কেমন যেন ধুলোটে ভাব মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

বসে থাকতে থাকতে মৃদুলা বলল, "তুই আজকাল বাড়িতে থাকিস না, যাস কোথায় ?"

"বাড়িতে ভাল লাগে না।"

"কেন ?"

"ও তুই বুঝবি না। আমি হয়ত আসছে হপ্তায় কোথাও যাব।"

"কোথায় ?" মৃদুলা অবাক হয়ে বলল।

"ঠিক নেই।...একটা কিছু করা দরকার, কী বল ?"

মৃদুলা শমীকের মুখ লক্ষ করল খুঁটিয়ে। তারপর বলল, "শমী, আমায় সত্যি করে একটা কথা বলবি ?"

"বল্ ?"

"তুই যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিস ; তাই না ?"

"বলতে পারিস।...আমার আর কিছু ভাল লাগে না, মৃদু। কিছু না। এক-একদিন রাত্রে মনে হয়, ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরে যাই।"

মৃদুলা যেন কেমন ভয় পেয়ে শমীকের হাতের কাছটা চেপে ধরল। বড় বড় চোখ করে বলল, "কী বলছিস ? তোর মাথায় এসব আবার কী ঢুকল ?"

শমীক বলল, "না রে, মরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। মরে যাওয়াটা ছেড়ে যাওয়া। কিন্তু এই যে আমরা বেঁচে আছি—এও তো মরে থাকা।"

"সবাই এভাবেই বেঁচে আছে।"

"হ্যাঁ, সবাই আছে। তুই, আমি—আমরা সবাই।" বলে শমীক অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, একটা সিগারেট ধরাল, মাঠের মাথায় রোদ পালানো দেখল। তারপর বলল, "আমার কী মনে হয় জানিস মৃদু, লোরেনজো ঠিক কথাই বলেছিল, এ একটা এমন যুগে আমরা

বেঁচে আছি যে-যুগে মানুষের কোথাও বিশ্বাস নেই, কেননা বিশ্বাসের কিছু এখানে নেই। আমাদের কোনো আদর্শ নেই। কেন থাকবে বল? আদর্শ কি গাছের ফল যে ঝুলে থাকবে? আমাদের কাছে কিছু সত্য বলে নেই। আমরা জন্মে গিয়েছিলাম বলে বেঁচে আছি। নয়ত এ বেঁচে থাকা শুধু নোঙরামি।"

মৃদুলা বলল, "না না, নোঙরামি বলিস না। চারদিকে তাকালে যত নোঙরামি দেখা যায় তার বাইরেও কিছু আছে।"

"তোর এখনও বোকামি আছে, মৃদু, আমার নেই। আমি ভেবে দেখেছি—আমাদের গোড়ায় গলদ ঘটে গেছে। আমরা কতকগুলো মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থেকে নিজেদের সর্বনাশ করেছি।" বলে শমীক সিগারেটটা ফেলে দিল। ভাল লাগছিল না। চুপ করে থেকে পরে বলল, "কোথায় যেন একটা গল্প পড়েছিলাম, জানিস মৃদু। পাহাড়ঘেরা একটা জায়গায় এক জাতের বেঁটে বেঁটে লোক থাকত। তাদের ধারণা ছিল মানুষ বড় হাল্কা, যে-কোনো সময়ে আকাশে উড়ে যেতে পারে পাখির মতন। পাছে উড়ে যায় সেই ভয়ে জন্মকাল থেকেই তারা কোমরের দু পাশে দুটো ভারী জলভরা পিপে ঝুলিয়ে রাখত। যার যেমন বয়েস, স্বাস্থ্য, সেই মাপের ওজন আর-কি। এইভাবে বংশপরম্পরায় তারা বেঁচে থাকল ওজন ঝুলিয়ে। শেষে কয়েকজনের মনে সন্দেহ দেখা দিল। কিন্তু ওজন খোলার সাহস হল না, যদি ওজন খুলে দিলে সত্যি সত্যি উড়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপারে গিয়ে পড়ে। শেষে একদিন একজনের কোমরের ওজন হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। সে তো ভয়ে মরে। এই বুঝি উড়ে যাবে, মাটিতে আর পা থাকবে না। ভয়ে সে বেচারী মাটি আঁকড়ে থাকল, কিছুতেই উঠে দাঁড়াবে না। শেষ পর্যন্ত সে মাটির ওপর উঠে দাঁড়াল। জন্মকাল থেকে কোমরে ভার নিয়ে হাঁটার অভ্যেস যার সে নির্ভার হয়ে হাঁটবে কী করে? হাঁটতে গেলে পা টলে যায়, এলোমেলো পা ফেলে, পড়তে পড়তে হাঁটে, কিন্তু উড়ে যায় না।

সবাই তখন দেখল, ভার না বাঁধা থাকলেও তারা আকাশে উড়ে যায় না, হাঁটতে পারে স্বাভাবিকভাবেই। তখন তারা ভাবল, হায় হায় —এতকাল আমরা বৃথাই কোমরের দু পাশে ভার বেঁধে কাটালাম ; বুঝলি মৃদু, সেদিন তারা বুঝল, ভারমুক্ত হবার কী সুখ।"

মৃদুলা শুধলো, "তুই কি বলতে চাস আমরাও সেইরকম ?"

শমীক বলল, "হ্যাঁ, আমিও তাই বলতে চাই। আমরা অনেক রকম ভার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভাবছি—এগুলো না থাকলে আমরা আর মানুষ থাকব না। এটা ভুল। মানুষ মানুষই থাকবে, শুধু ওই ভারগুলো ঝুলিয়ে তাকে কেন কষ্ট দেওয়া ?"

"এই ভারগুলো কী ?"

"তোদের ভগবান, তোদের সংস্কার, তোদের মিথ্যে ধারণা, এই সমাজের কর্তৃত্ব শাসন। তোদের চারদিকের আবহাওয়ায় শুধু বাঁধন আর বাঁধন।"

"আমি তোর কথা বুঝলাম না। সব যদি উঠিয়ে নেওয়া যায় তা হলে মানুষ সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে।"

"দিক। প্রথমে দেবে, তারপর দেবে না। তোরা এতরকম বাঁধন রেখেছিস, তাতেই কি মানুষ লণ্ডভণ্ড কম করছে! অনাচার আর নোঙরামি কোনটা হচ্ছে না। কোন দুঃখকষ্টটা তুই দেখছিস না। এই ভূতের নাচ, বেলেল্লাপনা, হুজুগে কাণ্ড, গুণ্ডা বদমাইশির ফাঁস তোর-আমার গলায় দিন দিন আঁট হয়ে বসে যাচ্ছে। আমরা মরব। কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।"

মৃদুলা যেন ছটফট করে উঠল। আলো পালিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে এল। শমীকের হাত টেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকল মৃদুলা। তারপর বলল, "শমী, মানুষ তো একদিনের নয়, অনেক দিনের ; তার বিশ্বাস, ধারণা, বোধ—এ-ভাবে পালটানো যায় না। তুই বড় জোর তার সংশোধন করতে পারিস।"

মাথা নেড়ে শমীক বলল, "অসম্ভব। তা হয় না। একটা

কথার কথা বলছি তোকে। ধর, আমাদের বাড়ি। এই বাড়ির ভিত থেকে ছাদ পর্যন্ত আমাদের তিন পুরুষে গড়ে তুলেছে। আমি যদি সংস্কার করতে চাই কতটুকু করতে পারি? বড় জোর একটা জানলা বাড়াতে পারি, ঘর বাড়াতে পারি, কিছুটা ফ্যাশানেবল্ করতে পারি—কিন্তু ওই কাঠামো আমি কেমন করে বদলাব। তা হয় না।"

মৃদুলা অবাক হয়ে বলল, "তুই কি গোটা সমাজটা বদলাতে চাস?"

"চাই।"

"কী করে?"

"সেটাই তো জানি না। আমি এটাও জানি না, যদি এই সমাজ গোড়া থেকে ভেঙে ফেলাও যায়—তা হলে তার বদলে আমি কোন নতুন সমাজ তৈরী করব!"

"তা হলে?"

"তাই তো ভাবছি। ভেবে পাচ্ছি না। শুধু এই বিশ্বাস আমার আছে, মানুষকে তার সমস্ত পুরোনো অনর্থক অপ্রয়োজনীয় ভার থেকে মুক্তি দিতে পারলে সে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন মূল্যবোধ গড়ে নেবে। আমি সভ্যতাকে স্বীকার করি, মানুষ যদি জন্তু হত মৃদু - এ-সভ্যতা গড়ে উঠত না। আমরা এত কষ্টের সভ্যতাকে মারছি। নষ্ট করছি। তার মধ্যে বিষ ঢোকাচ্ছি।"

মৃদুলা কথা বলল না। শমীককে সে অনেকবার অনেক কারণেই ছটফট করতে দেখেছে। উচ্ছ্বাস বলো, আবেগ বলো—কত সময়েই কত কথাই না সে বলেছে উচ্ছ্বাসের বশে। কিন্তু আজকের কথা তার কানে অন্যরকম শোনাল।

আরও একটু বসে থেকে মৃদুলা বলল, "উঠবি?"

অন্ধকার হয়ে আসছিল। আকাশ কালচে হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার

মাথার ওপর আকাশ থেকে শেষ আলো ডুবে গেল। কলকাতার কলরোল যেন কোনো দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে।

শমীক উঠে পড়ল, বলল, "চল্ তোকে ট্রামে তুলে দিই।"

হাঁটতে হাঁটতে গুমটির দিকে আসছিল শমীকরা। মৃদুলা বলল, "না, ওদিকে নয়, তুই আমায় লিণ্ডসে স্ট্রীটের ওখান থেকে তুলে দে। ভিড় ভাল লাগছে না।"

"আর একটু হাঁটবি?"

"হ্যাঁ।"

দুজনেই হাঁটতে লাগল। বাসের ভিড়, ট্রাম লাইন, ময়দান মার্কেট ছাড়িয়ে দক্ষিণের রাস্তা ধরল। মৃদুলা কথা বলছিল না। শমীকও চুপচাপ।

অনেকটা এসে মৃদুলা বলল, "শমী, তুই বলতিস তুই একটা সর্বনাশ করবি। এই কি তোর সেই সর্বনাশ?"

শমীক বলল, "হ্যাঁ। আমার সর্বনাশ বাইরের নয়, ভেতরের। যারা বাইরে বাইরে সর্বনাশ করে বেড়ায় তাদের সঙ্গে আমার মিল নেই। জগতে যা টিকেছে সেটা ভেতর থেকে এসেছে, বাইরে থেকে নয়।"

মৃদুলা কথাটায় যেন কান করল না। সামান্য পরে বলল, "তুই কোথায় যাবি?"

"এই আরাম সুখ নির্ভাবনা নিশ্চিন্ত অবস্থা থেকে পালাতে হবে।"

"কিন্তু কোথায় যাবি তুই?"

"তোকে বলব না।"

মৃদুলা দাঁড়িয়ে পড়ে শমীকের দিকে তাকাল। শমীক ঠোঁট বুজে থাকল।

হঠাৎ যে কী হল মৃদুলার, চোখ জলে ভরে উঠল, তারপর গালে গড়িয়ে পড়ল, মোটা মোটা ফোঁটায় গাল ভিজে গেল।

মৃদুলাকে ট্রামে তুলে দিয়ে শমীক হাঁটতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে খেয়াল করল না। আকাশ কালো হয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে সব কেমন ঘন কালো হয়ে গেল। তারা ফুটল অজস্র। ফাল্গুনের বাতাসে শীত ছোঁয়ানো। মাঠের অন্ধকার থেকে কে যেন হঠাৎ শমীকের পেছনে এসে দাঁড়াল। শমীক দাঁড়াল না। হাঁটতে লাগল।

যে এসেছিল শমীক তাকে অনুভব করতে পারল। লোরেনজো।

লোরেনজো যেন কানে কানে বলল, "আমরা কেন বেঁচে থাকলাম —এ আমাদের জানা হল না। কার জন্যে বেঁচে ছিলাম—তাও জানলাম না। আমাদের জন্মের আগেই কারা যেন আমাদের কবর খুঁড়ে রেখেছিল। মানুষের ইতিহাসের জঞ্জাল ভাবী করে তোলার জন্যেই আমরা। হয়ত এটাই ওরা চেয়েছিল।"

শমীক দাঁড়াল। ঘাড় ফেরাল।

তারপর দেখল, সে মাঠের মাঝখানে। কেউ কোথাও নেই। রেড রোড দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দমকলের গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। শব্দটা চারপাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা মাঠ আর অন্ধকারকে সচকিত করে তুলছিল।

শমীকের হঠাৎ মনে পড়ল, মৃদুলা এতোক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে।

শমীক ফিরতে লাগল।